আমরা ও হতে পারি
বিদ্যুৎ বিশারদ
দেবীদাস মজুমদার

● আমরাও হতে পারি ●

প্রথম বই

দেবীদাস মজুমদার

● বিদ্যুৎ-বিশারদ ●

১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলিকাতা-২০।
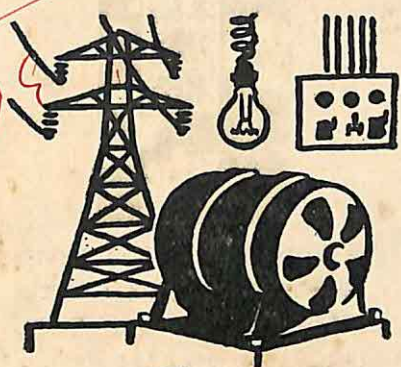
বিদ্যুৎ বিশারদ

দেবীদাস মজুমদার

বিদ্যুৎ
বিশারদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাড়িতে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। কী আলোর ঘটা, কী হট্টগোল। মিন্টুদির বিয়ে। খোকনের আজ আর চোখেকানে দেখবার অবসর নেই, সে হয়েছে ডেকরেশন ইন-চার্জ। সকাল থেকে ফ্লাডলাইট লাগানো, ছাদে লোক খাবার জায়গায় আলো টাঙানো, পাখা টাঙানো—এই সব হাজার রকম খবরদারি করতে করতে মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে।

সন্ধ্যাবেলা। বাড়ি তখন জমজমাট। নিচে উঠোনে মিনুদির সাতপাকের সাড়ে চার পাক মাত্র হয়েছে, ছাদে বরযাত্রীদের পরিবেশনের ফাঁকে খোকন সবেমাত্র একটা চপের আধখানা খেয়েছে। এমন সময় হঠাৎ গেলো সারাবাড়ি অন্ধকার হয়ে, সব আলো এক সঙ্গে নিভে।

বাবা হাঁক পাড়লেন মিস্ত্রি ডাক। কাকা বললেন অ্যাসিটিলিন জ্বাল। মিনুদি শুরু করলো কান্না। খোকন কেবল বললো, "কুচপরোটা নেই, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। ফিউজ হয়ে গেছে বোধহয়; চল তো ভোঁদা টর্চটা, স্ক্রুড্রাইভারটা, আর আমার রবারের চটিজোড়া নিয়ে নিচে, আমি বাকি চপটা শেষ করেই যাচ্ছি।"

মেন সুইচ খুলে খোকন কী সব করলো আর ব্যস, আবার আলো জ্বলে উঠলো। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, মিনুদি চোখের জল মুছে সাতপাকের বাকি আড়াই পাক ঘুরতে গেলো।

ভোঁদা-ফটকে কিন্তু অতো সহজে খুশি হবার ছেলে নয়। তারা খোকনকে খোশামোদ শুরু করে দিলো, "বলো না খোকনদা, ফিউজ ব্যাপারটা কী? বলো না খোকনদা, কী করে ফুসমন্তরে আবার আলো জ্বাললে?" খোকন বললো, "আচ্ছা কালকে মিনুদি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর বলবো। তার আগে কিন্তু এই জিনিস কটা ইলেকট্রিকের দোকান থেকে কিনে আনিস্।"

বাজারের ফর্দ

১) টর্চের বাল্‌ব্ আর ব্যাটারি
২) সরু তার (ওই বাল্‌ব্-এর উপযোগী)
৩) সুইচ
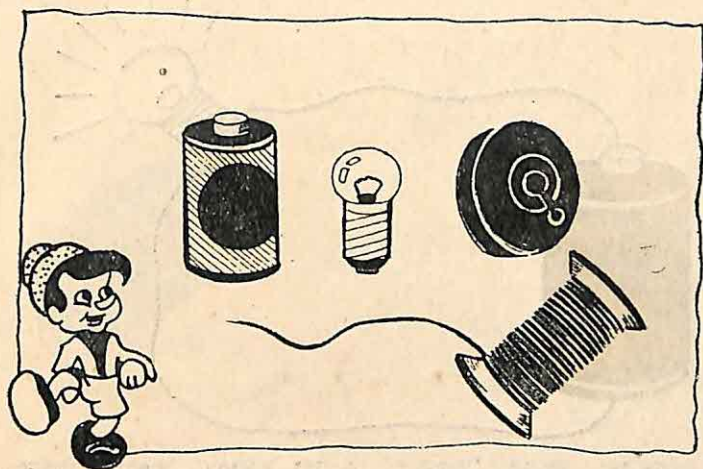
পরের দিন খোকন শুরু করলো ইলেকট্রিকের গল্প—

"আগে কয়েকটা পরীক্ষা করা যাক। এই টর্চের সেল বা ব্যাটারিকে তার দিয়ে জুড়ে দে টর্চের বাল্‌বের সঙ্গে ; দেখ, আলো জ্বলছে। এইবার তারটাকে মাঝখান থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে আলাদা করে দিয়ে দেখ, আলো নিভে গেলো। কাটা তারের মুখ দুটো একসঙ্গে জুড়ে দে, দেখবি আবার আলো জ্বলছে। এইবার কাটা তারের মুখ দুটো আলাদা করে মাঝখানে একটা সুইচ বসিয়ে দে। সুইচ টান, দেখবি আলো জ্বলছে। সুইচ নিভিয়ে দে, দেখবি আলো নিভে গেলো। (চার নম্বর আর পাঁচ নম্বর পাতার ছবিতে এই পরীক্ষার সারমর্ম পাওয়া যাবে।)

"এই পরীক্ষাটা থেকে আমরা কী শিখলাম ?"
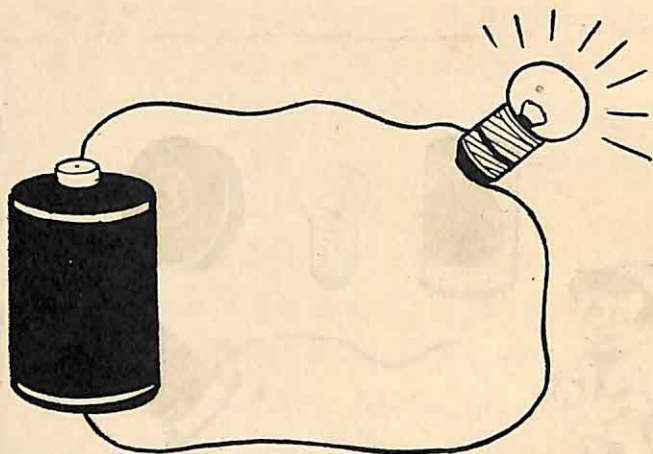
ভোঁদা বললে, "কেন? এ তো সোজা কথা। টর্চের সেলের পেটের ভেতর ইলেকট্রিক পোরা আছে। যেই বাল্ব্‌টা তার দিয়ে সেলের সঙ্গে জুড়ে দিলে অমনি তার বেয়ে ইলেকটিক
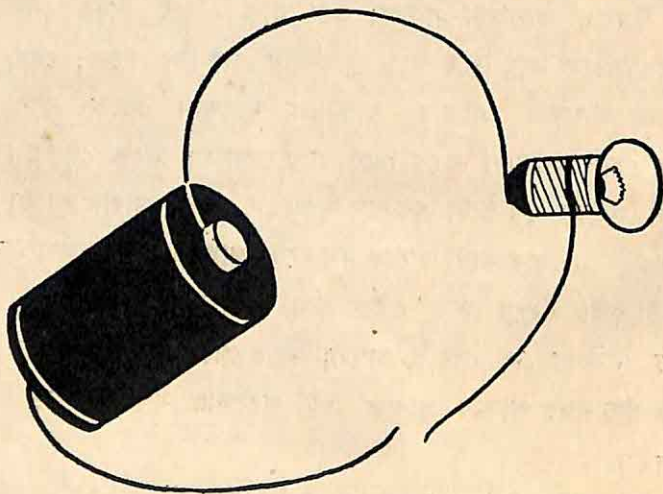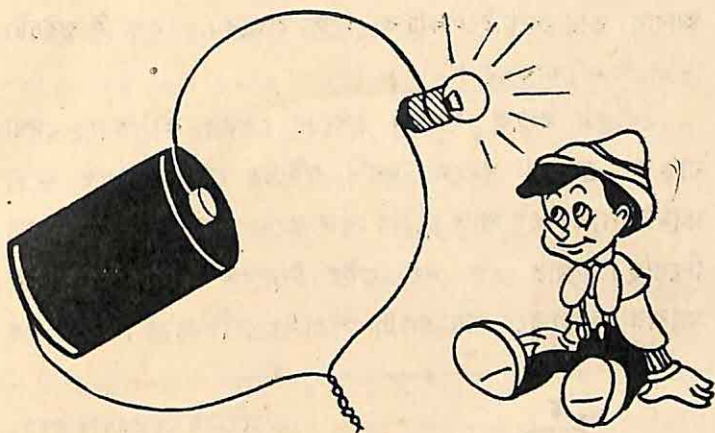
এসে আলো জ্বালালো। তারটা যখন কেটে দিলে তখন আলো তো নিভে যাবেই, বাল্‌বে ইলেকট্রিক যাবে কী করে যে আলো জ্বলবে!"

ফটকে বললে, "আর যেই কাটা তার জোড়া দিলে অমনি
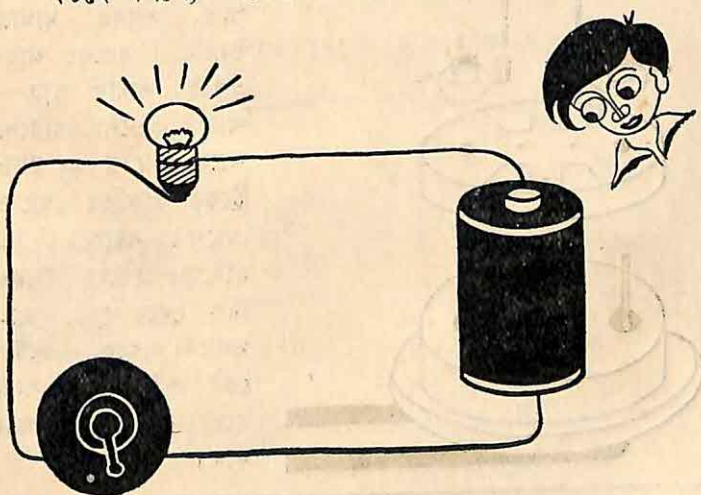
আবার তার বেয়ে ইলেকট্রিক গেলো বাল্‌বে। কিন্তু ঐ সুইচটা দিলে কেন খোকনদা ?”

খোকন বললে, “আগে সুইচের ভেতর কী আছে দেখা যাক। সুইচটা খুললে দেখবি সুইচের ভেতর আছে দুটো তামার পাত; এই পাত দুটোর সঙ্গে কাটা তারের দুটো মুখ জুড়ে দিয়েছি। আর এই দেখ, সুইচ টানলেই তামার পাত দুটো আবার জোড়া হয়ে যায় একটা পেতলের ছোট পাত দিয়ে। এই
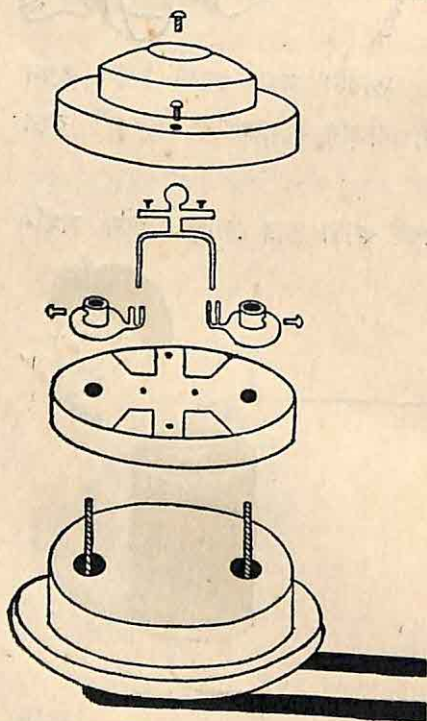
সুইচের ভেতরকার খবর। সবচেয়ে ওপরের ছবিতে—দুপাশের স্ক্রু খুলে সুইচের ঢাকনি। মাঝখানের ছবিতে—সুইচের ভেতরকার দুপাশের দুটো তামার পাত, তাদের মাথায় উলটো U ধরনের আরএকটা তামার পাত—আর এগুলো বসানো আছে কাঠের বা প্লাসটিকের চাকতির খোপে-খোপে। সবচেয়ে নিচের ছবিতে—সুইচের পিছন দিক থেকে দুটো তার গলানো হয়েছে, এ-দুটোকেই ওই তামার পাত দুটোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে।

পেতলের পাতটা একটা ইংরিজি ইউ (∩) উল্টোলে যেরকম দেখায় সেই রকম দেখতে। এই পেতলের পাতটা আছে সুইচের মুণ্ডিটার সঙ্গে লাগানো, সুইচটা জ্বাললে এই পেতলের পাতটা তামার পাত দুটোকে জুড়ে দেয়, কাজেই তখন সেল থেকে তার বেয়ে ইলেকট্রিক তামার পাত ও পেতলের পাত হয়ে বাল্‌বে যায় আর আলো জ্বালায়। সুইচটা নিভিয়ে দিলে,—অর্থাৎ সুইচের মুণ্ডিটা ওপরের দিকে ঠেলে দিলে—পেতলের পাতটা তামার পাত দুটো থেকে সরে যায়, কাজেই এ-তামার পাত থেকে ও-তামার পাতে আর ইলেকট্রিক যাবে কী করে? আর তাই বাল্‌বটা নিভে যায়—ইলেকট্রিক তো আর বাতাসের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারে না, তার বা পাত বা ওই রকম কোনো-একটা বাহন তার চাইই।

"আগের পরীক্ষায় একটা বাল্‌ব্ জ্বালার ব্যবস্থা দেখালাম। যদি দুটো বাল্‌ব্ জ্বালতে হয় তাহলে তার দিয়ে দুটো বাল্‌ব্
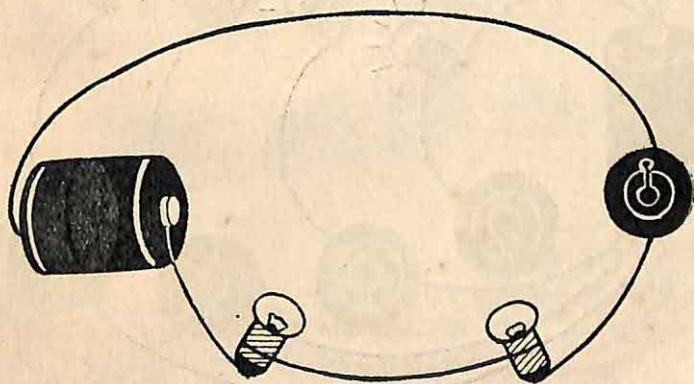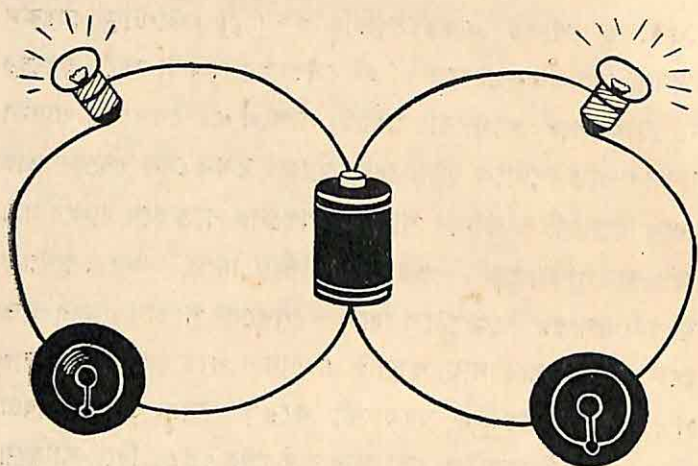
সেলের সঙ্গে লাগা সুইচটার ভেতর দিয়ে। সুইচটা জ্বাললে আগের বারের মতন বাল্‌ব দুটো জ্বলবে ; সুইচ নেভালে বাল্‌ব্
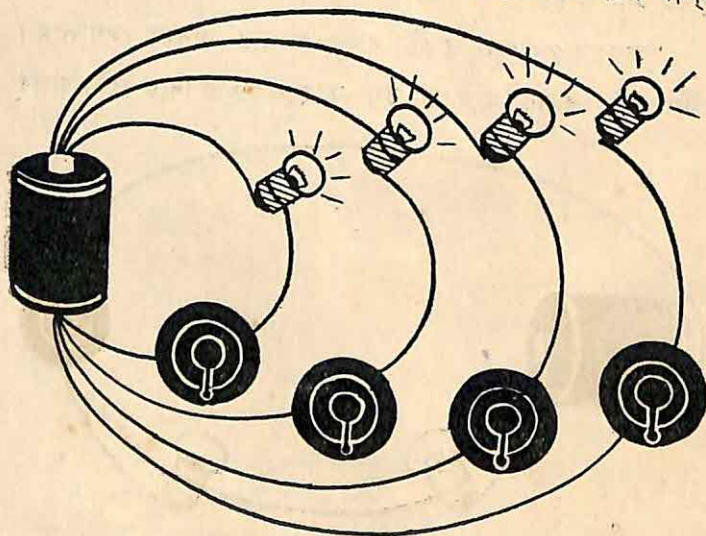
দুটো নিভে যাবে। এই ব্যবস্থায় দুটো বাল্‌বই একসঙ্গে জ্বলবে বা একসঙ্গে নিভবে।

"যদি বাল্‌ব্ দুটোর মধ্যে যেটা যখন খুশি জ্বালাতে বা নেভাতে চাস তাহলে দুটো সুইচ লাগবে—যখন যে-সুইচটা জ্বালা থাকবে সেলের ভেতর থেকে ইলেকট্রিক সেই সুইচের ভেতর দিয়ে সে-বাল্‌বে গিয়ে বাল্‌ব্‌টা জ্বালাবে।

"এইরকম ভাবে চারটে পাঁচটা সাতটা বা যতোগুলো খুশি আলো জ্বালাতে পারা যায়। তবে সেলটা থেকে প্রত্যেক আলোর জন্যে একটা করে আলাদা সুইচ লাগবে। ওদের বাড়ির শেফালীর পুতুলের বিয়ে, তার পুতুলের বাড়িতে আলো লাগিয়ে দিতে হবে বলে নাকি-কান্না জুড়েছে। তার জন্যে এখনই আলোর ব্যবস্থা করছি। দেখ চুপ করে বসে।
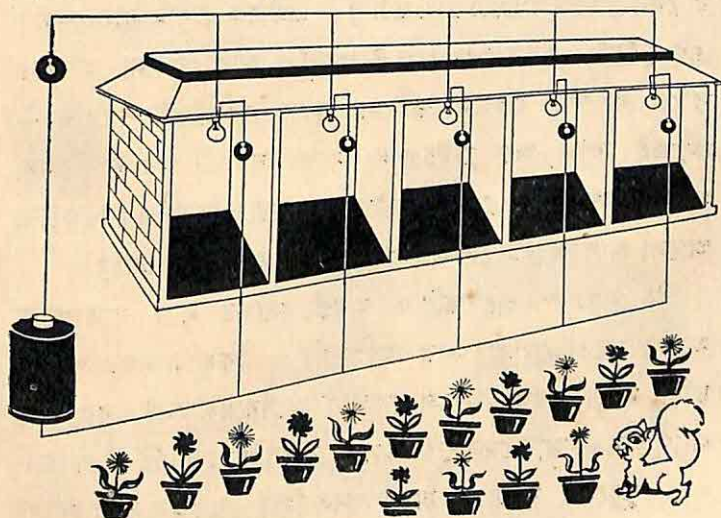
"এই দেখ পুতুলের বাড়িতে আলোর ব্যবস্থা করা হয়ে গেলো। প্রত্যেক ঘরে একটি করে আলো দিয়েছি, প্রত্যেক ঘরে একটা করে আলোর সুইচ দিয়েছি। যখন যে-আলোটা জ্বালতে চাস তখন সেই সুইচটা জ্বালবি।"

ফটকে বললে, "কিন্তু খোকনদা, এই পুতুলের বাড়িতে তো কয়েকটা নতুন জিনিস করেছো ; সেগুলোর কথা তো বললে না ? পাঁচটা আলোর জন্যে ছটা সুইচ দিয়েছো কেন ? আর ৮ নম্বর পাতার ছবিতে চারটে আলোর জন্যে সেলে চার জোড়া তার লাগিয়েছো, কিন্তু শেফালীর বাড়িতে সেলে মোটে একজোড়া তার দিয়েছো কেন ?"

খোকন বললে, "ওঃ এই কথা! তাহলে শোন। এই যে সুইচটা দিয়েছি সেলের সব-কাছে, এটাকে বলে প্রধান সুইচ বা মেন সুইচ (main switch)। এটাকে প্রধান বলে কেন ? এই সুইচটা নেভানো থাকলে ইলেকট্রিক আর কোনো আলোর কাছে বা অন্য কোনো সুইচের কাছে পৌঁছতেই পারে না— কাজেই তখন অন্য সুইচগুলো যতো খট-খট কর না কেন, আলো জ্বলবে না। মেন সুইচটা জ্বেলে রেখে তারপর যে-কোনো আলো জ্বালতে চাস সে-আলোর সুইচটা জ্বালালেই চলবে।

"৮ নম্বর পাতার ছবিতে অবশ্য সেলের সঙ্গে যতোগুলো আলো ততো জোড়া তার লাগিয়েছি। কিন্তু ৯ নম্বর পাতার ছবির মতো ব্যবস্থা করলে কোনো অসুবিধেই নেই, বরং তার লাগে কম,—আর মেন সুইচ বসানোর সুবিধা হয় এই ব্যবস্থায়।

"পুতুলের বাড়িতে টর্চের সেল দিয়ে যে-রকম করে আলো

জ্বালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বালানোর ব্যবস্থাটা অনেকটা সেই রকম। পুতুলের বাড়িতে সেলটা বসিয়ে দিয়েছি বাড়িতেই। কিন্তু আমাদের বাড়িতে যখন ইলেকট্রিক আসে তখন সেল বা ব্যাটারিটা আমাদের বাড়িতে বসানো থাকে না, ব্যাটারিটা থাকে ইলেকট্রিক কোম্পানির কারখানায়। তবে সেখানে ঐ টর্চের ব্যাটারির মতো পুচকে একটা ব্যাটারি থাকে না, ইয়া বিরাট বিরাট ব্যাটারি থাকে। সেই ব্যাটারি থেকে আমাদের বাড়িতে তার আসে মাটির নিচে দিয়ে, মানে রাস্তার তলা দিয়ে। অবশ্য ইলেকট্রিক কোম্পানি অনেক সময় রাস্তার ধারে খুঁটি পুঁতে খুঁটির ওপর দিয়েও তার নিয়ে আসে। এই তার বেয়ে ইলেকট্রিক এলো আমাদের বাড়িতে—কোম্পানির কারখানার ব্যাটারি থেকে।
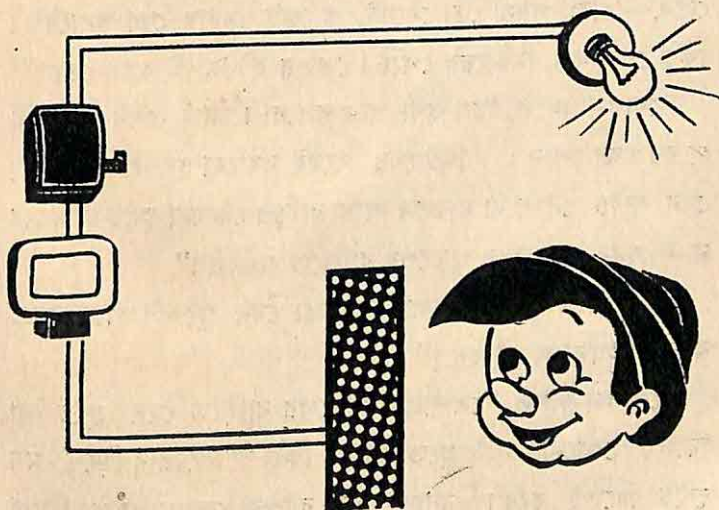
"আমাদের বাড়িতে ইলেকটিক আগে ঢোকে মিটারে। ট্যাকসির যেমন মিটার থাকে, আর আমরা মিটার দেখে কতো ভাড়া উঠলো ঠিক করি, তেমনি আমাদের বাড়ির মিটার দেখে বোঝা যায় কতো ইলেকট্রিক খরচা হলো আর ইলেকট্রিক বাবদ কোম্পানি আমাদের কাছে কতো টাকা পাবে।"

ভোঁদা বললে, "শেফালীর পুতুলের বাড়িতে মিটার তো কই বসাও নি?"

খোকন বললে, "তুই একেবারেই ভুঁদো। আমি কি আর শেফালীর কাছে তার পুতুলের বাড়ি সাজালাম বলে পয়সা নিতে যাবো যে আমি মিটার বসাবো?"

ফটকে বললে, "তা তো বটেই। আর ইলেকট্রিক কোম্পানি তো আমাদের মামা নয় যে বিনি পয়সায় ইলেকট্রিক দেবে,—তারা পয়সা তো নেবেই, কাজেই মিটার তো বসাবেই। কিন্তু খোকনদা, মিটারের পেটের ভেতর কী আছে বলো তো।"

খোকন বললে, "সে-কথা পরে বলবো। আজ এখন মিটারের পরের খবর শোন। মিটারের পরেই বসানো হয় মেন স্থইচ! মেন স্থইচ নেভানো থাকলে আর বাড়ির কোনো আলো জ্বলবে না—যেমন শেফালীর পুতুলের বাড়িতে দেখলি।"

ফটকে জিগ্‌গেস করলো, "আচ্ছা মেন স্থইচটা পয়সা খরচ করে না লাগালে কী হয়?"

খোকন বললে, "শেফালীর পুতুলের বাড়িতে মেন স্থইচ না দিলেও কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে মেন স্থইচ দিতেই হবে। কারণ, ধর বাড়ির কোনো তার কিংবা
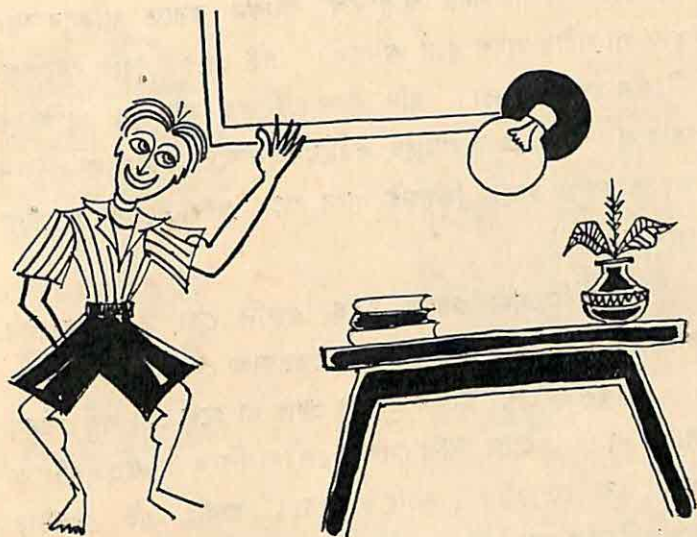
কোনো সুইচ খারাপ হয়ে গেছে। তুই বদলাতে চাস। বাড়িতে মেন সুইচ থাকলে, সেই সুইচটা বন্ধ করে দিলে বাড়ির ভেতর আর ইলেকট্রিক ঢুকবে না, তুই নিশ্চিন্দি মনে তার বদলাতে বা সুইচ খুলে মেরামত করতে পারিস। কিন্তু বাড়িতে যদি মেন সুইচ না থাকতো, তাহলে বাড়ির ভেতরের তারে সবসময়ই ইলেকট্রিক থাকতো, তার বদলাতিস কী করে? শক্ খেতিস যে!"

ভোঁদা বললে, "শক্ কাকে বলে খোকনদা?"

খোকন বললে, "কোনো তার দিয়ে যখন ইলেকট্রিক যায় তখন যদি সেই তারে হাত দিস, তাহলে তোর হাত বেয়ে ইলেকটিক তোর শরীরের ভেতর সুড়ুত করে ঢুকে যাবে; তোর শরীরের ভেতরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুর ভেতর দিয়ে

ইলেকট্রিক যাবার সময় স্নায়ুগুলো ঝনঝন করতে থাকবে আর হাত-পা-শরীর অবশ হয়ে আসবে। এই একেই বলে ইলেকট্রিকের শক্ খাওয়া। যদি ইলেকট্রিকের জোর খুব বেশি হয় তাহলে শক্‌ও জোর লাগবে, শরীরের ভেতরের স্নায়ুগুলো ঝনঝন করতে করতে হয়তো ছিঁড়েই যাবে আর তুই একেবারে পটল তুলে বসবি।"

ফটকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই এক্ষুনি তো তুমি পুতুলের বাড়ির তারে হাত দিলে, কই তুমি তো অক্কা পেলে না…"

খোকন বললে, "ইলেকট্রিকের জোর না হলে তো শক্ তেমন লাগে না। এই যে টর্চের সেলটা ভোঁদা কিনে এনেছে, এটাকে বলে এক ভোল্টের (volt) সেল। অর্থাৎ এই সেলটার ইলেকট্রিকের জোর হচ্ছে এক ভোল্ট। যেমন গজ-ইঞ্চি-ফুট দিয়ে কাপড় মাপে, তেমনি ইলেকট্রিকের জোর মাপার মাপকাঠি হচ্ছে ভোল্ট। কোম্পানি আমাদের বাড়িতে যে ইলেকট্রিক দেয় তার জোর হচ্ছে দু-শো কুড়ি ভোল্ট।"

ভোঁদা বললে, "মানে ইলেকট্রিক কোম্পানির কারখানায় এইরকম দু-শো কুড়িটা সেল পর পর জুড়ে রেখেছে আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক দেওয়ার জন্যে, না খোকনদা?"

খোকন বললে, "ঠিক তা নয় অবশ্য। এইটুকু পুঁচকে সেলের মধ্যে বেশিক্ষণ ইলেকট্রিক দেবার শক্তি নেই; একটা টর্চ একনাগাড়ে জ্বেলে রাখলে দেখবি যে ১৪।১৫ ঘণ্টা বাদেই সেলের ইলেকট্রিক ফুরিয়ে গেলো আর টর্চটা নিভে গেলো। আর এই সেলগুলো এইরকম ধারা যে ইলেকট্রিক ফুরিয়ে গেলে এদের
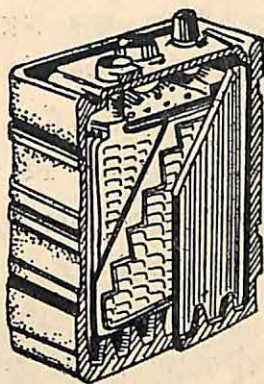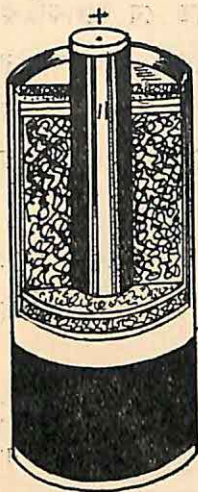
ফেলে দেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। ইলেকট্রিক কোম্পানি আর কী করে দিনে ছবার ব্যাটারি ফেলে দেয়? কতো পয়সা নষ্ট হবে না? কাজেই তারা আর-এক রকম ব্যাটারি ব্যবহার করে, যার ইলেকট্রিক ফুরিয়ে গেলে আবার তার ভেতর ইলেকট্রিক পোরা যায়। এ-পাতার ছবিতে দেখ ইলেকট্রিক কোম্পানির ব্যাটারি আর টর্চের ব্যাটারির তফাত কোথায়। ছবির বাঁ-দিকের ব্যাটারিটা হলো টর্চের ব্যাটারি আর ডানদিকের যে-রকম ব্যাটারি তাকে স্টোরেজ ব্যাটারি (storage battery) বলে। ছবির এই স্টোরেজ ব্যাটারিটার জোর হচ্ছে ছটো টর্চের সেলের সমান, অর্থাৎ ছ-ভোল্ট। কাজেই এই রকম এক-শো দশটা ব্যাটারি একসঙ্গে করলেই ছশো কুড়ি ভোল্ট হবে; অনেকটা এই রকম ব্যবস্থাই ইলেকট্রিক কোম্পানিতে আছে।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমাদের বাড়িতে যে ইলেকট্রিক আসে তার জোর ২২০ ভোল্ট আর শেফালীর পুতুলের বাড়ির ইলেকট্রিকের জোর মোটে এক ভোল্ট। কাজেই আমাদের বাড়ির ইলেকট্রিকের তারে শক্ লাগে, কিন্তু পুতুলের বাড়ির তারে শক্ লাগে না।"

ফটকে বললে, "এই তো আমাদের বাড়ির দেওয়াল বেয়ে ইলেক্ট্রিকের তার এসেছে, এই দেখো না হাত দিচ্ছি, কই শক্ তো লাগছে না?"

খোকন বললে, "এইবার খুব চালাকের মতো কথা বলেছিস! একটু আগেই তোদের বললাম না যে ইলেকট্রিক যেতে তার বা আর কিছু বাহন লাগে। কিন্তু সব রকম জিনিস তো সমান বাহন নয়। যেমন ধর, এই যে পুতুলের বাড়ির তার বা আমাদের বাড়ির তার—এ হচ্ছে তামার তৈরী। কেন জানিস? কারণ, তামার ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক অতি সহজেই যেতে পারে। অবশ্য তামার তারের চেয়েও রুপোর তারের ভেতর দিয়ে ইলেক-ট্রিক আরও সহজে যায়, কিন্তু অতো দামী রুপোর তার দিয়ে কে আর বাড়িতে ইলেকট্রিক আনবে বল? কিন্তু তামার বদলে লোহার কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের তার যদি লাগাই তাহলে ইলেকট্রিক যাবে বটে, তবে তামার তারের মতন অতো সহজে যাবে না। আর যদি রবারের তার—"

ভোঁদা হাঁক করে উঠলো, "রবারের তার! হাঁ-করা আর কাকে বলে? রবারের সুতো বলো।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ রবারের সুতো। যদি রবারের সুতো
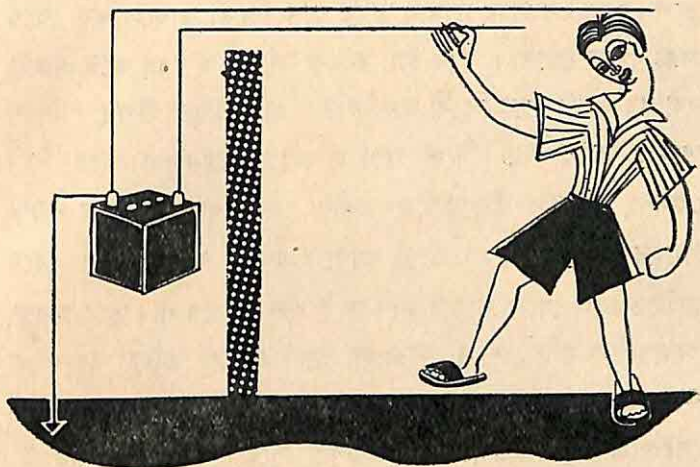
লাগাস তামার তারের বদলে, তাহলে ইলেকট্রিক একদম যাবে না। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে--রুপো, তামা, লোহা, অ্যালু-মিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক যেতে পারে, কিন্তু রবার, সুতো (তুলোর সুতো), সিল্ক, কাঠ প্রভৃতি জিনিস--অর্থাৎ যারা ধাতু নয়—তাদের ভেতর দিয়ে যেতে পারে না। আমাদের বাড়ির ইলেকট্রিকের তারের ভেতরটা তামার তৈরি, কিন্তু সেই তামার উপরে রবারের একটা খোলস সেঁটে দেওয়া আছে। (৪০ নম্বর পাতার ছবি দেখতে হবে)। কাজেই ফটকে যখন ভাবছে যে সে ইলেকট্রিক তারে হাত দিয়েছে তখন আসলে সে হাত দিয়েছে তারের বাইরের রবারে। ভেতরের তামার তারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রিক, কিন্তু সে ইলেকট্রিক তো আর বাইরের রবার বেয়ে ফটকের হাতে আসতে পারছে না। কাজেই ফটকে শক্‌ খাচ্ছে না। ফটকে যদি বাইরের রবারটা চেঁছে

তুলে ফেলে ভেতরের তামার তারে হাত দিতো তাহলে শক খেয়ে অক্কা পেয়ে যেতো। তবে হ্যাঁ, ফটকে যদি বুদ্ধি খরচ করে একটা রবারের জুতো পরে কিংবা কাঠের টুল বা পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তামার তারে হাত দিতো তাহলে অবশ্য তেমন শক্ খেতো না। কেননা, তাহলে ইলেকট্রিক শরীর বেয়ে এগুলেও শেষ পর্যন্ত পায়ের নিচের রবার বা কাঠে আটকে যাবে; অর্থাৎ শরীর বেয়ে মাটিতে চলে যেতে পারবে না। তাই শক্ লাগবে না। তবে অবশ্য, ইলেকট্রিক যদি তেমন জোরালো হয় তাহলে ওটুকু রবার বা কাঠ টপকে লাফিয়ে যেতে পারে; তাই শক্ লাগতে পারে। সেইজন্যে শুধুমাত্র রবারের জুতোটুকুই পুরোপুরি নিরাপদ নয়।"

ভোঁদা বললে, "আর মেন স্থইচ বন্ধ করে তারে হাত দিলে তো আর রবারের জুতো পরার হাঙ্গামাও করতে হতো না।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ তাতো বটেই। মেন স্থইচ বন্ধ করলে তারে তো ইলেকট্রিকই থাকবে না,—শক খাবে কোত্থেকে!

"কাজেই বুঝছিস্, মেন স্থইচটা কি রকম দরকারি জিনিস: বাড়ির ভেতরের ইলেকট্রিকের তার বদলাতে বা অন্য কিছু মেরামত করার সময় যাতে শক্ না খাস তার জন্যে ইচ্ছেমতো বাড়ির ভেতরে ইলেকট্রিক আসা বন্ধ করার জন্যেই এই মেন স্থইচ বসানো হয়।

"মেন স্থইচের ভেতর খুলে দেখাই এবার। ১৯ নম্বর পাতার ছবি দেখ। আসলে এটা হচ্ছে দুটো স্থইচ—এক-সঙ্গে-করা। ইলেকট্রিক কোম্পানির ব্যাটারি থেকে যে দুটো তার বাড়ি অবধি আসে তার প্রত্যেক তারেই একটা করে স্থইচ লাগানো আছে। আর
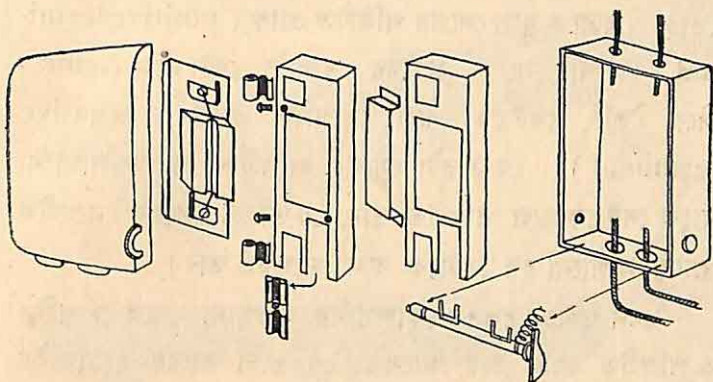
এই সুইচ দুটো একত্র করে একটা বাক্সে এমনভাবে সাজানো আছে যে দুটো তারের সুইচই একসঙ্গে জ্বলে আর একসঙ্গে নেভে।"

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "কিন্তু দুটো সুইচ কেন ? পুতুলের বাড়িতে তো মোটে একটা তারেই মেন সুইচ লাগিয়েছিলে !"

খোকন বললে, "আমাদের বাড়ির ইলেকট্রিক যে ২২০ ভোল্টের আর পুতুলের বাড়ির ইলেকট্রিক যে মোটে এক ভোল্টের। কাজেই পুতুলের বাড়িতে একটা তারে সুইচ লাগালেও আমাদের বাড়িতে পজিটিভ (positive) আর নেগেটিভ বলে (negative) দুটো তারেই মেন সুইচ লাগাতে হয়।"

"পজিটিভ নেগেটিভ কী তা তো কই বলোনি ?" ফটকে জিজ্ঞাসা করলো।

খোকন বললো, "ওঃ বড্ডো ভুলে গেছি বলতে। সেলের মাঝখান থেকে একটা ছোট্ট পেতল-মোড়া মুণ্ডি বেরিয়েছে দেখেছিস

তো? সেটাকে বলে সেলের পজিটিভ প্রান্ত (positive terminal)। আর সেলের বাইরের খোসাটা, যেটা দস্তা (zinc) দিয়ে তৈরি, সেটাকে বলে নেগেটিভ প্রান্ত (negative termimal)। যে-তারটা সেলের পজিটিভ প্রান্তে লাগানো থাকে সেটাকে বলে পজিটিভ তার, যে-তারটা সেলের নেগেটিভ প্রান্তে লাগানো হয় সেটাকে বলে নেগেটিভ তার।

"মেন সুইচের ভেতর কোম্পানির কারখানা থেকে নেগেটিভ ও পজিটিভ ছুটো তার আসে। সে ছুটো তারেই ছুটো সুইচ লাগানো থাকে এ তো এক্ষুনি বললাম। পুতুলের বাড়িতে যেমন মেন সুইচের পর তার সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছে, এখানে কিন্তু তা যায়নি,—মাঝে ফিউজ আছে। মেন সুইচের বাক্সের ভেতর দেখ, চিনেমাটির ছুটো ছোটো ছোটো লাঠির মতন লাগানোর জায়গা করা আছে। এই লাঠি ছুটোকে বলে ধারক বা হোলডার (holder)। এরা ফিউজের তার ধরে রাখে বলে এদের ঐ নাম। যদিও ছুটো হোলডারের জায়গা আছে তবুও আসলে কিন্তু মাত্র একটাই ব্যবহার করা হয়, আর অন্যটার জায়গা খালি থাকে ; সেখানটায় একটা তামা কি ঐ ধরনের একটা ধাতুর পাত লাগানো হয়।"

ভোঁদা বললে, "ঐ যে ফিউজ বললে—সেটা কী জিনিস? আর যদি হোলডার মোটে একটা লাগবে তো ছুটোর জন্যে জায়গাই বা করেছে কেন? আর দেখালে তো, হোলডার মোটে একটা তারে লাগানো হয়, কিন্তু সেটা কোন তার তা তো বললে না? নেগেটিভ তার, না পজিটিভ তার, খোকনদা?"
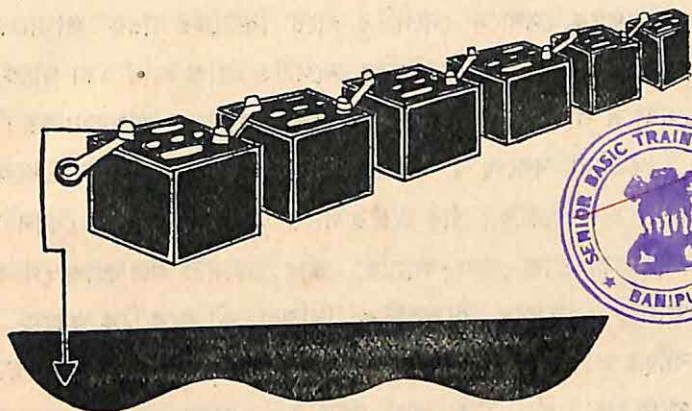
আর্থ করা : একটা প্রান্তের তার মাটির মধ্যে ঢুকোনো।

খোকন বললে, "আরে বাস্‌রে! অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসলি যে! এক-এক করে উত্তর দিই। আগে সবশেষ প্রশ্নটার জবাব দিই। তবে তার আগে আর-একটা কথা বলে নিই। কোম্পানির কারখানার যে-ব্যাটারি থেকে আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আসে সেই ব্যাটারির একটা প্রান্তের (terminal) তার মাটির সঙ্গে ঠেকানো থাকে—পাতার মাথায় ছবি দেখ। একে বলে আর্থ-করা (earth-করা) বা আর্থিং-করা। তাই বলে ভোঁদা, বাঙলায় যেন মাটি-করা বলে বসিস না! যে-তারটা এই আর্থিং-করা প্রান্ত থেকে আমাদের বাড়িতে আসে সে-তারটায় হোলডার লাগানো থাকে না, তামার বা অন্য ধাতুর পাত লাগানো থাকে। যে-তারটা আর্থিং-না-করা প্রান্ত থেকে আসে সেই তারটাতেই ফিউজের হোলডার লাগানো থাকে। এখন কোনো ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত আর্থ

করা থাকে, সেখানে নেগেটিভ তারে ফিউজের ধারক লাগানো হয়। আবার কোনো ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত আর্থ-করা থাকে, সেখানে পজিটিভ তারটাতেই ফিউজের হোলডার লাগানো হয়।"

ভোঁদা বললে, "আমাদের বাড়িতে তো কোম্পানি থেকে দুটো তার দিয়েছে ; তার দুটোর গায়ে তো লেখাও নেই কোনটা আর্থ-করা প্রান্ত থেকে আসছে, আর কোনটা অন্য প্রান্ত থেকে আসছে। তাহলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা কী করে ঠিক করবে—বাড়ির তারের কোনটা আসছে আর্থ-করা প্রান্ত থেকে ? তাদের পক্ষে তো এটা ঠিক করা দরকার ; কেননা তুমিই বলছো যে-তারটা আর্থ-করা প্রান্ত থেকে আসে নি সেটাতেই ফিউজের হোলডার লাগাতে হবে।"

খোকন বললে, "বাড়ির কোন তারটা কোম্পানির ব্যাটারির আর্থ-করা প্রান্তে লাগানো আছে তা জানবার একটা সোজা উপায় আছে। মিস্ত্রিরা করে কি, বাড়িতে লাগানোর একটা বাল্‌ব বাল্‌বের-হোল্ডারে লাগিয়ে নেয়। হোল্ডার কাকে বলে জানিস তো ?"

ফটকে বললে, "হ্যাঁ, ও আর কে না জানে ? ইলেকট্রিক তারের তলায় ঝোলে তো ? যাতে ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ লাগানো হয়। তবে এতোক্ষণে সেগুলোকেও হোলডার কেন বলে তা বুঝলাম—বাল্‌বকে ধরে রাখে বলেই বলে বাল্‌বের হোলডার বা ধারক, যেমন ফিউজ ধরে থাকে বলেই মেন সুইচের ওই অংশটাকে বললে ফিউজের ধারক বা ফিউজ-হোলডার।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ, মিস্ত্রিরা ঐ একটা বাল্‌ব্-হোল্‌ডার-এ

বাল্‌ব্‌ লাগায় আর লাগায় দুটো তার। তারপর সেই তারের একটা লাগায় কোম্পানি থেকে পাঠানো তারের একটাতে আর বাল্‌ব্‌ হোলডারের অন্য তারটা বাড়ির দেওয়ালে ঠেকায় আর নয়তো বাড়ির উঠোনে কি অন্য জায়গায়,—যেখানটায় শান বাঁধানো নেই একেবারে জমি আছে,—সেখানটায় ঠেকায়। (অবশ্য এই রকম উঠোনে ঠেকাতে হলে তার একটু লম্বা নিতে হয়)। এই রকম ব্যবস্থায় যদি বাল্‌ব্‌টা জ্বলে তাহলে জানবি যে কোম্পানি থেকে পাঠানো এই তারটা আর্থ-না-করা প্রান্ত থেকে এসেছে; আর আলো না জ্বললে জানবি তারটা আর্থ-করা প্রান্ত থেকে এসেছে। একটা কথা এখানে বলে নিই : আর্থ-করা প্রান্ত থেকে যে-তারটা এসেছে মিস্ত্রিরা তাকে বলে 'ঠাণ্ডা' তার, আর আর্থ-না-করা-প্রান্ত-থেকে-আসা তারটাকে বলে 'গরম' তার।"
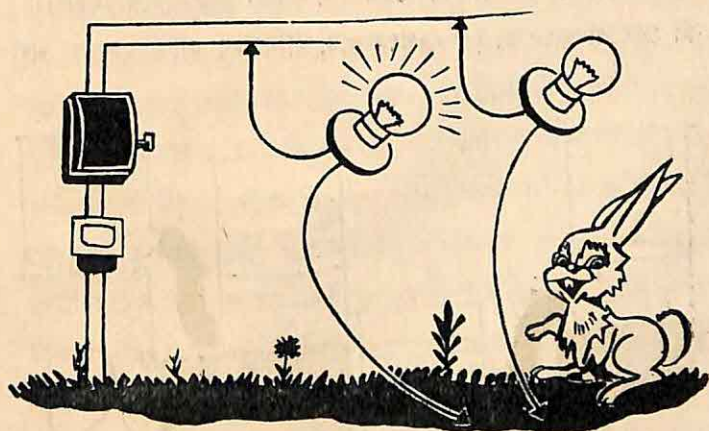
এর মধ্যে কোনটে "ঠাণ্ডা"-তার আর কোনটে "গরম"-তার ?

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "ঠাণ্ডা-তারটায় বাল্‌ব্‌ লাগালে বাল্‌ব্‌টা জ্বলে নাই বা কেন আর গরম তারে লাগালেই বা জ্বলে কেন? আর বাল্‌বের একটা তার ঠাণ্ডা বা গরম তারে লাগিয়ে অন্য তারটা দেওয়ালে বা উঠোনের মাটিতে ঠেকানোর কথা বললে কেন?"

খোকন বললে, "এই কথাটা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে, তার বেয়ে ইলেকট্রিক কী করে যায়? একটা পরীক্ষা করে দেখাই। এই দেখ একটা কাঁচের পাত্র, এর নিচের দিকে একটা নর্দমা করে দিয়েছি (পাতার নিচের ছবি দেখো)। এই নর্দমায় একটা রবারের নল লাগালাম, আর রবারের নলের অন্য দিকটা ঐ রকম আর-একটা কাঁচের পাত্রের সঙ্গে লাগালাম। এইবার বাঁদিকের পাত্রে খানিকটা জল ঢাললাম আর ডানদিকের পাত্রটা বেশ খানিকটা নিচু করে ধরলাম। কী দেখবো বল তো? দেখবো যে, বাঁদিকের পাত্র থেকে নল
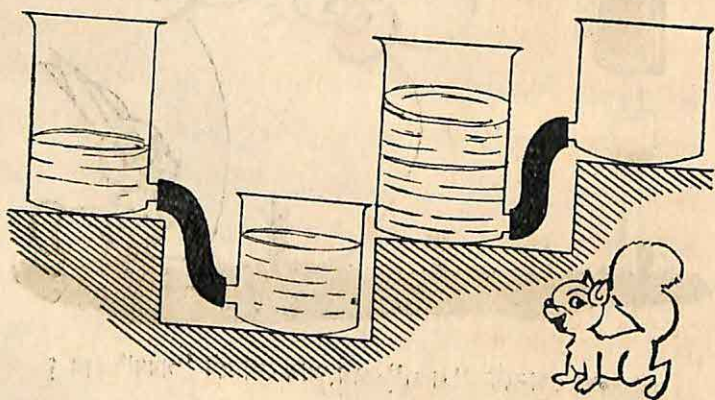
বেয়ে জল সুড়সুড় করে ডানদিকের পাত্রে ঢুকছে। কিন্তু যদি ডানদিকের পাত্রটা উঁচু করে ধরি তাহলে কী দেখবো ? দেখবো যে বাঁদিকের পাত্রের জল বাঁদিকের পাত্রেই রয়ে গেলো, ডানদিকে আর গেলো না।" (২৪ নম্বর পাতায় দুটো পরীক্ষার ছবি আঁকা হয়েছে)।

ভোঁদা বললে, "ভারি ভেল্কি দেখালে! এ আর কে না জানে? জল উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় যায়, কখনও নিচু জায়গা থেকে উঁচুতে যায় না।"

খোকন বললে, "জল যেমন সব সময় উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় যায়, ইলেকট্রিকও তেমনি সবসময় তার বেয়ে পজিটিভ প্রান্ত থেকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে যায়।"

ফটকে বললে, "তাঁর মানে, পজিটিভ প্রান্তটা নেগেটিভ প্রান্ত থেকে উঁচুতে আছে—না, খোকনদা ?"

খোকন বললে,—"হ্যাঁ, অবশ্য, চোখে দেখতে উঁচুতে নয়, তবে ইলেকট্রিকের ব্যাপারে উঁচু। যেমন জল নল দিয়ে উঁচু থেকে নিচুর দিকে যায়, তেমনি ইলেকট্রিকও পজিটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভ প্রান্তের দিকে যায়। পজিটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভ প্রান্তে তার লাগা, বা অন্য কোনো রকম করে পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্ত যোগ করে দে,—ইলেকট্রিক পজিটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভ প্রান্তে যাবে।"

ভোঁদা বললে, "তারের বদলে অন্য কোন রকমে কী করে পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্ত জোড়া দেবে?"

খোকন বললে, "এই দেখ না পরের পাতায় ছবি।
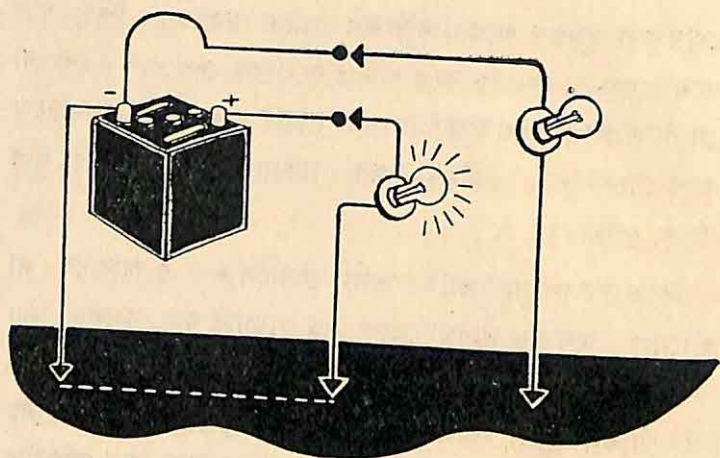
ছবির এই দুটো বাল্‌ব্‌-এর মধ্যে একটা কেন জ্বলবে আর একটা কেন জ্বলবে না ? ভেবে-চিন্তে জবাব দিতে হবে।

মিস্ত্রিরা ঠাণ্ডা-গরম তার দেখার সময় কী হয় ? বাল্‌বের হোল্‌ডারের একটা তার তো মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়েছি, আর অন্য তারটা তো ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে পাঠানো তারের একটাতে ঠেকালাম। এখন ধর, এই কোম্পানির ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তটা আর্থ-করা আছে, আর ধর বাল্‌বের একটা তার লাগিয়েছিস পজিটিভ-প্রান্ত-থেকে-আসা তারে। তাহলে কী হবে ? ব্যাটারি থেকে পজিটিভ প্রান্তের তার বেয়ে ইলেকট্রিক এসে বাল্‌বের মধ্যে ঢুকে বাল্‌বের অন্য তার দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে যাবে, সেখানে থেকে মাটির মধ্যে দিয়ে কোম্পানির ব্যাটারির আর্থ-করা তার দিয়ে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে ফিরে যাবে—এর বদলে বাল্‌বের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক যাবে বলেই বাল্‌ব্‌ জ্বলবে। কিন্তু ধর, যদি বাল্‌বের হোল্‌ডারের

ওই তারটা কোম্পানির ব্যাটারির নেগেটিভ-প্রান্ত-থেকে-আসা তারে লাগাস, তাহলে কী হবে? পজিটিভ প্রান্ত থেকে ইলেকট্রিক নেগেটিভ প্রান্ত অবধি আর যেতে পারবে না। কোম্পানির ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে আমাদের বাড়ি অবধি না হয় তার বেয়ে ইলেকট্রিক এলো, তারপর আর তো সেটার সঙ্গে বাল্ব্ অবধি তার লাগানো নেই, ইলেকট্রিক কী করে বাল্বে যাবে? কাজেই বাল্ব্ জ্বলবে না।"

ফটকে বললে, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে ইলেকট্রিক ধাতুর মধ্যে দিয়ে যায়, যেগুলো ধাতু নয় তাদের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। তবে মাটির মধ্যে দিয়ে কী করে গেলো?"

খোকন বললে, "ইলেকট্রিক ধাতু ছাড়া অন্য অনেক জিনিসের মধ্যে দিয়ে যায়,—যেমন মাটির মধ্যে দিয়ে যায়, যেমন তোর শরীরের মধ্যে দিয়ে যায়, যেমন জলের মধ্যে দিয়ে যায়।"

ভোঁদা বললে, "কিন্তু যদি কোম্পানির বাড়ির ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তটা আর্থ-করা থাকে তাহলে কী হবে?"

ফটকে বললে, "তুই একটা গোমুখ্যু। তখন নেগেটিভ-প্রান্ত-থেকে-আসা তারটায় বাল্বের হোল্ডারের তার লাগালে বাল্ব্ জ্বলবে—এটা আর বুঝলি না? ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে আর্থের তার বেয়ে মাটিতে ইলেকট্রিক এলো, মাটি বেয়ে আমাদের উঠোনে এলো, তারপর তার বেয়ে বাল্বে গেলো, সেখান থেকে কোম্পানির তার বেয়ে কোম্পানির ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে ফিরে গেলো। নয়, খোকনদা?" (পরের পাতার ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে)।
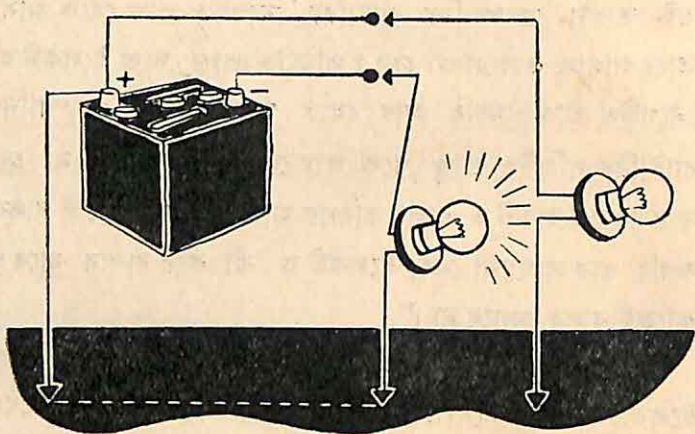
ব্যাটারির পজিটিভ-প্রান্ত আর্থ-করা বলেই এবার কোন বাল্‌ব-টা জ্বলবে আর কোনটা জ্বলবে না তার ছবি।

খোকন বললে, "ঠিক বলেছিস। ইলেকট্রিকের বেলায় একটা কথা মনে রাখা দরকার। জলের বেলায় নিয়ম হলো : জলের পাত্রটা উঁচু করলেই নল বেয়ে জল বেরোবে। ইলেকট্রিকের বেলায় নিয়ম হলো : পজিটিভ আর নেগেটিভ প্রান্ত জোড়া না দিলে ইলেকট্রিক যাবে না। এইবারে বল তো, তারে হাত দিলে ইলেকট্রিক শক্‌ লাগে কেন? আর, পায়ে রবারের চটি থাকলে শক্‌ কেন লাগে না?"

ভোঁদা বললে, "আচ্ছা খোকনদা—"

খোকন আর ভোঁদাকে শেষ করতে দিলে না। বলে উঠলো, "এখন অতো প্রশ্ন রাখ। আমায় এখন বলে মাঠে যেতে হবে, আজ যে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ সে কথাটা কি ভুলে মেরেছিস? আবার কাল ইলেকট্রিকের গল্প হবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
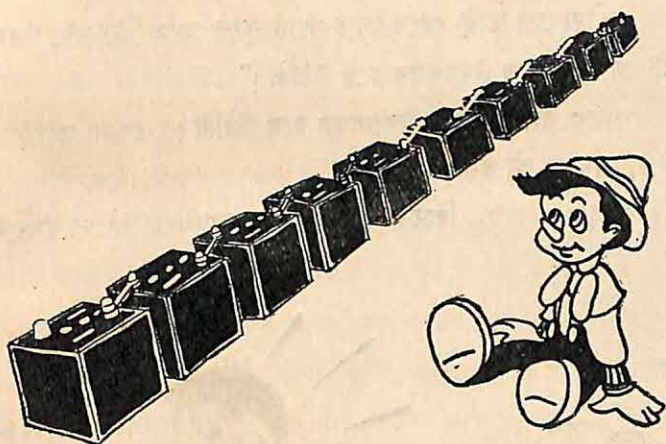
পরের দিন সকালবেলাতেই ভোঁদা আর ফটকে গিয়ে ধরেছে খোকনকে— ইলেক্‌ট্রিকের বাকি গল্পটা শোনাবার জন্যে।

ভোঁদা বললে, "কাল তো ফিউজ কেন হয় তাই-ই বললে না!"

খোকন বললে, "অতো যদি ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসে থাকো তো বাপু ইলেক্‌ট্রিকের গল্প শুনতে হবে না। বিদ্যে তো পেটে ঢুঁ ঢুঁ, একটু গোড়া থেকে না বললে বুঝবি কী করে?

"আজকে আর-একটা পরীক্ষা করি, সেটা আগে বোঝ। একটা টর্চের সেল নিয়ে সেটার পজিটিভ আর নেগেটিভ প্রান্ত দুটো একটা ছোটো তামার তার দিয়ে জুড়ে দে। দিয়েছিস? এইবার ফটকে তারটা দু-আঙুল দিয়ে চেপে ধর দেখি!"

ফটকে তারটা ধরেই একেবারে নৃত্য শুরু করে দিলে।

ভোঁদা তো তাই দেখে ফ্যাচ-ফ্যাচ করে হেসে উঠলো, "ওঃ, তুই যে একেবারে উদয়শঙ্কর হয়ে উঠলি!"

ফটকে বললে, "হ্যাঁ, উদয়শঙ্কর হয়ে উঠলি! দে-না তারটায় হাত, দেখ-না কী হয়?"

ভোঁদাও হাত দিয়েই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো, "ওরে

বাবাঃ, কী গরম! আঙুলে এক্কেবারে ফোস্কা পড়ে গেলো যে! কী হলো বলো দিকি খোকনদা?"

খোকন বললে, "তারের ভেতর ইলেক্‌ট্রিক গেলেই তার গরম হয়ে ওঠে। এটা ইলেক্‌ট্রিকের একটা গুণ। যতো বেশি ইলেক্‌ট্রিক যাবে তারটা ততো বেশি গরম হবে। যদি ইলেক্‌ট্রিক ডবল যায় তো গরম হবে চারগুণ, যদি ইলেক্‌ট্রিক তিনগুণ যায় তো গরম হবে নগুণ; মানে, ইলেক্‌ট্রিক যতোগুণ যাবে তারটা গরম হবে তার বর্গগুণ বেশি।

"কাজেই তারের ভেতর দিয়ে যদি খুব বেশি ইলেক্‌ট্রিক যায় তাহলে তারটা গরম হতে-হতে একেবারে টকটকে লাল হয়ে যাবে আর শেষ পর্যন্ত পুড়ে যাবে।"

ফটকে বললে, "ওমা, আমাদের বাড়ির এই ইলেকট্রিকের তারগুলো তো তাহলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে বেশি ইলেক্‌ট্রিক গেলে!"

খোকন বললে, "সেই শোকে মড়া কান্না জুড়তে হবে না। যারা ইলেক্‌ট্রিকের তার লাগিয়েছে তাদের বুদ্ধি তোর চেয়ে বেশি। তারা যাতে সব তার পুড়ে নষ্ট না হয়ে যায়, সে-ব্যবস্থা করেছে।"

ফটকে বললে, "আহা, ওই বেশি-বুদ্ধির ব্যাপারটাই খুলে বলো না! পুড়ে যে যায় না, তা তো চোখেই দেখছি; কিন্তু কেন পোড়ে না সে-কথাই তো বুঝতে পারছি না।"

খোকন বললে, "ইলেক্‌ট্রিকের তার তো তামার হয় বলেছি। তামার তার গরম হয়ে—লাল টকটকে হয়ে—পুড়ে ছাই হওয়া

বন্ধ করা যায় কী করে? যদি এমন ব্যবস্থা করি যাতে, ঐ তারটা তেমন বেশি গরম হবার আগেই ইলেক্‌ট্রিক বন্ধ করে দেওয়া হয়।"

ভোঁদা বললে, "এ আর শক্ত কথা কী? তারের মধ্যে একটা সুইচ লাগিয়ে দাও,—যেই তার গরম হয়ে উঠবে অমনি সুইচ বন্ধ হয়ে যাবে আর তাই বন্ধ হবে তারের ভেতর দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক যাওয়া।

খোকন বললে, "সাধে কি আর তোকে ভুঁদো বলি! ব্যবস্থা যা বললি তা একেবারে খাসা। বলি, তার গরম হচ্ছে বুঝবে কে, আর কেই-বা সুইচ বন্ধ করবে? তোর ব্যবস্থা মানতে হলে তোকেই দেখছি তারের পাশে বসিয়ে রাখতে হবে। তুই সর্বক্ষণ বসে থাকবি তারের গায়ে আঙুল লাগিয়ে,—গরম ঠেকলেই অমনি সুইচ বন্ধ করে দিবি।"

ফটকে বললে, "তার মানে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি তারের জন্যে একটি করে ভোঁদা লাগবে! না, খোকনদা?"

খোকন বললে, "হুঁ। পৃথিবীতে অতো ভোঁদা কোথায়? তাই এর থেকে ঢের সোজা ব্যবস্থা হচ্ছে তামার তারের জোড়ের জায়গায় ছোট্ট একটু করে সিসের তার লাগিয়ে দেওয়া। তামার তার আর সিসের তার দুইএর ভেতর দিয়েই ইলেকট্রিক যাবে আর দুটোকেই গরম করবে। গরম হয়ে সিসে গলে যায় তামার চেয়ে ঢের ঢের আগে। কাজেই বেশি গরম হয়ে তামা পোড়ার অনেক আগেই সিসের তারটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আর তখন তামার তারের মধ্যে দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক যাওয়াও বন্ধ হবে।"
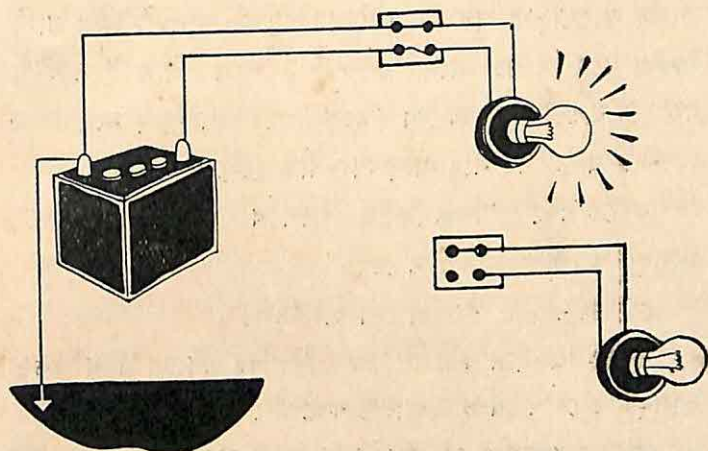
তামার তারের জোড়ের মুখে এক টুকরো সিসের তার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে—তার গরম হতে হতে তামার তার গলবার ঢের আগেই সিসের তার গলে যাবে—তখনই ফিউজ হয়ে যাবে : আলো জ্বলবে না।

ফটকে বললে, "কেন, তামার তারের মধ্যে দিয়ে আর ইলেক্‌ট্রিক যাবে না কেন ?"

ভোঁদা বললে, "এটাও বুঝলি না, বোকা ? সিসের তারটা পুড়ে গেলে পর ইলেক্‌ট্রিক কী করে পজিটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভ প্রান্তে যাবে ? মাঝে তার যে খানিকটা নেই,—ইলেক্‌ট্রিক তো আর বাঁদরের মতন বাতাসের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারে না।"

খোকন বললে, "ঠিক বলেছিস ! এই যে সিসের তারটুকু, এইটারই নাম ফিউজ। ফিউজ (fuse) কথাটা ইংরাজি, ওর মানে হলো 'গলে যাওয়া'। অতএব যে-তারটা গলে গিয়ে তামার

তারটাকে পোড়ার হাত থেকে বাঁচায় তাকেও বলে ফিউজ। বাড়ি ফিউজ হয়ে যাওয়া মানে, ফিউজ-তার গলে গিয়ে ইলেক্‌ট্রিক বন্ধ হয়ে যাওয়া—সব আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার! মনে আছে মিনুদির যখন সেই সবে সাড়ে চার-পাক হয়েছে…"

ফটকে বললে, "কিন্তু ফিউজ গলে বা পুড়ে যেতে হলে ইলেক্‌ট্রিক বেশি যেতে হবে তো।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ তা তো বটেই।"

ফটকে জিজ্ঞাসা করলো, "কিন্তু মিনুদির বিয়ের দিন হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক বেশি যেতে আরম্ভ করলো কেন?"

খোকন বললে, "এই কথাটা বোঝবার আগে আমার একটু কাজ কর দিকি! মিনুদির বিয়ের জন্যে একগাদা বাল্‌ব্‌ এনেছিলাম, সেগুলো ঐ ঝুড়িতে পড়ে আছে। আর এই আলমারির ভেতর বাল্‌বের কাগজের বাক্সগুলো আছে—মিলিয়ে মিলিয়ে বাল্‌ব্‌গুলো বাক্সয় পোর দিকি।"

ফটকে আর ভোঁদা তো লেগে পড়লো বাল্‌ব্‌গুলোর তদ্বিবত করতে। একটু বাদেই ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা এই বাল্‌ব্‌গুলোর গায়ে চল্লিশ ওয়াট, ষাট ওয়াট এই যে সব লেখা আছে,—এগুলোর মানে কী? ওয়াট কাকে বলে?"

খোকন বললে, "জানিস তো, পেটুকদের নামের পেছনে অনেক সময় খাওয়ার হিসেব জোড়া থাকে?"

ফটকে বললে, "হ্যাঁ, আধমণী কৈলাস—লোকটা নাকি আধ মণ খেতে পারতো।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ, সেই রকম। অর্থাৎ কিনা, কোন বাল্‌ব্‌

কতো পেটুক,—মানে কে কতো ইলেকটিক খেতে পারে,—সেটা বাল্‌বের গায়ে লেখা থাকে। এই দেখ, এই বাল্‌বের গায়ে লেখা আছে : চল্লিশ ওয়াট। তার মানে, এই বাল্‌বটা চল্লিশ ওয়াটের ইলেক্‌ট্রিক খায়, অর্থাৎ এই বাল্‌ব্‌টাকে ইলেক্‌ট্রিকের তারে লাগালে এটা কোম্পানির ব্যাটারি থেকে চল্লিশ ওয়াট ইলেকট্রিক টেনে নিয়ে আসবে।"

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "কিন্তু ওয়াট কী,—তাই তো বললে না!"

খোকন বললে, "ওয়াট হলো ইলেকটিকের একটা মাপ, যেমন তুই রসগোল্লা কিনিস সের-দরে, তেমনি ইলেক্‌ট্রিক বেচাকেনা হয় ওয়াট-দরে।"

"কিন্তু বাল্‌ব্‌রা বেশি-কম খায় কী করে?"

"যে বাল্‌বের পেট যতো বড়ো, সে ততো বেশি ওয়াট ইলেক্‌ট্রিক খাবে। আর যে যতো বেশি ইলেক্‌টিক খাবে, সে ততো বেশি আলো দেবে। যে বাল্‌ব্‌ মাত্র পাঁচ ওয়াট খায়, সে আলো দেয় টিম্‌টিম্‌ করে; আর একশো ওয়াটের বাল্‌বের আলোর দিকে তাকানোই যায় না, এতো জোর।

"এখন ব্যাপার হলো, যতো ওয়াটের বাল্‌ব্‌ লাগাবে ততো ওয়াট ইলেক্‌ট্রিক সে খাবেই খাবে। মিনুদির বিয়ের রাতে আলোয়-আলো করার জন্যে সব্বাই মিলে, প্রাণভরে বাল্‌ব্‌ লাগিয়েছে আর সব বাল্‌ব্‌গুলো রাক্ষসের মতো ইলেক্‌ট্রিক গিলতে শুরু করে দিলো। কাজেই বাড়ির ইলেকট্রিকের তারের মধ্যে দিয়ে বেশি ইলেক্‌ট্রিক যেতে আরম্ভ করে দিলো আর তাই তারের জোড়ের

ফিউজ-তার গরম হয়ে গলে পুড়ে গেলো আর ফিউজ হয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেলো।

"আগেই বলেছি, মেন-সুইচের ভেতরকার হোলডারে এক টুকরো করে সিসের ফিউজ-তার লাগানো থাকে। আসলে সেটাই পুড়ে গিয়েছিলো। আমি করলাম কি, মেন সুইচ বন্ধ করে, হোলডারের যে ফিউজ-তারটা পুড়ে গিয়েছিলো সেই তারটা বদলে আবার এক টুকরো সিসের ফিউজ লাগিয়ে দিলাম। আর ব্যস, আবার আলো জ্বলে উঠলো।"

ভোঁদা বললে, "কিন্তু ছাতের বাল্‌ব্‌গুলো তো তারপরও একই ভাবে ইলেক্‌ট্রিক গিলতে লাগলো! তাহলে আবার কেন ফিউজ হলো না?"

খোকন ভোঁদার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, "এইবার খুব বিজ্ঞের মতো কথা হয়েছে। যতোগুলো বাল্‌ব্‌ ফিউজ হওয়ার আগে লাগানো ছিলো, ততোগুলো বাল্‌ব পরেও লাগানো থাকলে আবার ফিউজ হতো; কেননা মানুষ-পেটুকদের পেট ভর্তি হলে খাওয়া বন্ধ হয় বটে কিন্তু পেটুক-বাল্‌ব্‌রা যতোদিন বাঁচে সমানে খেয়ে চলে। কাজেই সব বাল্‌ব্‌গুলো মিলে আগেও যা ইলেক্‌ট্রিক খাচ্ছিলো, এখনও তাই খাবে,—তার মানে আবার বেশি ইলেক্‌ট্রিক গিয়ে ফিউজ-তার পুড়ে যাবে। কাজেই ইলেক্‌ট্রিক যাওয়াই কমাতে হবে, অর্থাৎ দুচারটে বাল্‌ব্‌ খুলে ফেলতে হবে। আমি তাই করেছিলাম কি, ফিউজ-তার বদলানোর আগেই কয়েকটা দুশো-চারশো ওয়াটের বাল্‌ব্‌ খুলে ফেলেছিলাম।"

ফটকে বললে, "আচ্ছা ফিউজ-তারটা সিসের বলেই না গলে

গেলো! তুমি যদি ফিউজ-হোলডারের ভেতর সিসের তার না দিয়ে তামার তারই একটুকরো লাগিয়ে দিতে, তাহলে তো বাল্‌ব্‌ দুচারটে না খুললেও চলতো।"

খোকন বললে, "অনেক বোকা মিস্ত্রিতে তাই করে। বিয়ে-বাড়িতে কেবল কেবল ফিউজ হলে কাজের অসুবিধা হবে বলে তারা ফিউজ-হোলডারের সিসের তার বার করে তামার তার লাগিয়ে দেয়। তাতে ফিউজ হয় না বটে, কিন্তু সারা বাড়ির তার পুড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সিসের ফিউজ থাকলে, বেশি ইলেক্‌ট্রিক গিয়ে তামার তার পোড়ার আগেই ফিউজ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তামার তার লাগাও, তাহলে ফিউজ-তার আর ইলেক্‌ট্রিকের তার একই সঙ্গে পুড়বে, কাজেই ফিউজ তার লাগানোর আসল যে উদ্দেশ্য—বাড়ির ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলোকে পোড়ার হাত থেকে বাঁচানো—তা আর হবে না।"

ভোঁদা বললে, "খোকনদা, আজ থাক এখানে, আমার আজ লাট্টুর কম্‌পিটিশন আছে মন্টের সঙ্গে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
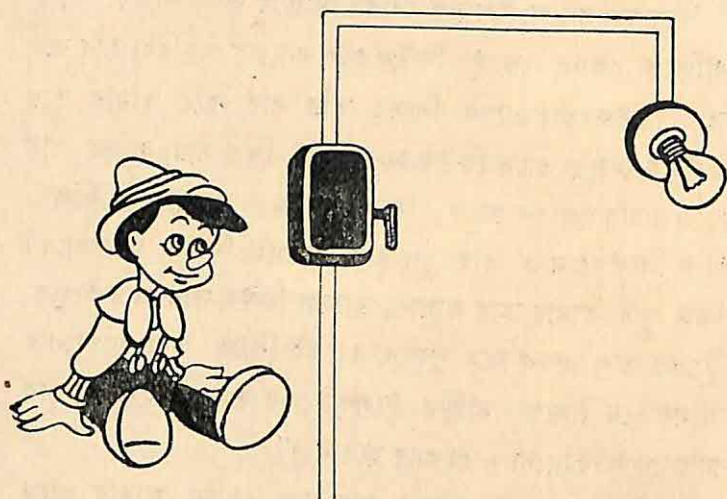
পরের দিন খোকন বললে, "মই ঘাড়ে করতে পারিস যদি তো আজ কী করে বাড়িতে ইলেকট্রিকের তার লাগায় দেখিয়ে দেবো।"

ভোঁদা-ফটকে তো খুব রাজি। ডেকরেটরদের আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদের দুটো মই ওরা হেঁইও-হেঁইও করে টানতে টানতে নিয়ে এলো।

খোকন বললে, "আগে মেন স্যুইচটা বন্ধ করে দিই। তারপর আয় দেখি, ইলেকট্রিকের তার কোথায় গেছে।

"মেন সুইচের ভেতর কী আছে সে তো আগেই বলেছি—ফিউজ-হোলডার আর তাতে লাগানো ফিউজ-তার।

"এই দেখ, মেন সুইচ থেকে একজোড়া তার এলো আর-একটা লোহার বাক্সে; এই বাক্সটার নাম মেন ডিসট্রিবিউশন বোর্ড বা বক্স (Main Distribution Board or Box)। কী, ফটকে থেকে-থেকে হাঁ করছিস কেন, কিছু বলবি নাকি?"

ডিস্‌টি বিউশন বক্স-এর ছবি পাওয়া যাবে ৪৯ পাতায় আর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ৪৪ পাতায়।

ফটকে বললে, "তুমি বলছো, মেন সুইচ থেকে একজোড়া তার এলো মেন ডিস্‌ট্রিবিউশন বক্সে। কিন্তু কই একজোড়া তার তো দেখছি না, মোটে তো একটা তার দেখছি!"

খোকন বললে, "ইলেকট্রিকের তার অনেক রকম হয়। আমাদের বাড়ির এই যে তার, এটার নাম সিসে-ঢাকা তার—ইংরাজিতে বলে Lead Covered Cable, সংক্ষেপে বলে এল-সি (LC) তার। একটা কথা: বাঙলায় সব সময় তার বললেও, একটা তার থাকলে ইংরাজিতে ওয়ার (wire) বলে; কেব্‌ল্‌ (cable) বলে যদি দুটো-তিনটে তার একত্র থাকে বা তাদের উপর রবার ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা থাকে। বাড়ির তার সব সময় রবার ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা থাকে বলে বাড়ির ইলেক্‌ট্রিকের তারকে কেব্‌ল্‌ (cable) বলাই উচিত।

"এই এল-সি-কেব্‌ল্‌ বা LC cable-এর পেটের খবর একটা

ছবি এঁকে দেখাই (এই পাতার নিচের ছবি দেখো)। সব-ভেতরে আছে তামার সরু-সরু তার, কয়েকটা তামার তার আবার একত্রে সলতের মতো করে পাকানো, সেই সলতের উপর রবারের খোসা, তার উপর নেকড়ার একটা ফিতে জড়ানো ; এই রকম আবার কয়েকটা সরু-সরু তারের ওপর রবার আর নেকড়ার ফিতে জড়িয়ে আর একটা তার তৈরী হয়েছে। তারপর দুটো জড়ানো তার পাশাপাশি রেখে সবশুদ্ধ সিসে দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে, কাজেই বাইরে থেকে দেখতে একটা তার মনে হলেও আসলে এটা একজোড়া তার।

ফ্লেক্‌সিব্‌ল্‌-ওয়ার : ৪৭ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা আছে।
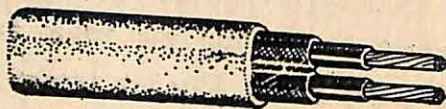
ভি. আই. আর. (V. I. R.)
কেব্‌ল্‌ : ৪২ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা আছে

এল্‌-সি (L.C.) কেব্‌ল্‌ : এই
পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা আছে।

"এই দেখ, একটুকরো এল-সি তার সেবার রেখে দিয়েছিলাম,

তোদের আজ খুলে দেখাই।"

খোকন এক-টুকরো এল-সি তার ছুরি দিয়ে কেটে উপরের সিসের খোলসটা ছাড়িয়ে দেখালো।

ভোদা বললে, "রবার-মোড়া দুটো দড়ার মতো তো দেখছি, কিন্তু একটা রবার লাল আর অন্য রবারটা কালো দেখতে কেন ?"

খোকন বললে, "দু রকম রঙ দেওয়া হয় কাজের সুবিধের জন্যে। লাল রঙের তারটা লাগানো হয় মেন সুইচের গরম তারে : মানে, কোম্পানির ব্যাটারির আর্থ-না-করা প্রান্ত থেকে যে-তারটা এসেছে সেই তারটা মেন সুইচের যেখানে লাগানো আছে সেখানে একটা হোলডার দিয়ে ফিউজ-তার লাগিয়ে ফিউজের অন্য দিকে এই লাল রঙের তারটা লাগানো হয়। কাজেই বুঝছিস, যদি মেন সুইচটা লাগিয়ে দিই, তাহলে লাল তারটা গরম তার হবে আর কালো তারটা ঠাণ্ডা হবে। কারণ, মেন সুইচের ভেতর দিয়ে লাল তারটা কোম্পানির ব্যাটারির আর্থ-না-করা প্রান্তে গেছে আর কালো তারটা গেছে আর্থ-করা প্রান্তে।"

> এ-সব ব্যাপার ভালো করে বুঝতে হলে ৫০ পৃষ্ঠার দু-রঙের ছবিটা মাথা ঠাণ্ডা করে দেখো, আর বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ো। সে-ছবিটায় গরম তার লাল রঙ দিয়ে আঁকা, ঠাণ্ডা তার কালো দিয়ে আঁকা।

ফটকে বললে, "এল-সি ছাড়া অন্য তার কী আছে বলবে না ?"

খোকন বললে, "সব রকম তারের কথা আর বলবো না ; তবে দু-এক রকমের কথা আরও বলবো।

"এল-সি তারে উপরের খোসাটা সিসের ; ভেতরের শাস সব ঠিক রেখে উপরের সিসের বদলে একটা রবারের খোলস-দেওয়া তারকে বলে ভি. আই. আর. কেব্‌ল্ (V.I.R. Cable-Vulcanised India Rubber Covered Cable)। আজকাল এল-সি তারের বদলে ভি. আই. আর.-কেব্‌ল্-ই (V.I.R.-Cable) বেশি চলে।

"আর-এক রকমের তার ব্যবহার হয়। এতে একজোড়া তার একত্রে খোলসে না পুরে এক-একটা রবার-মোড়া তার আলাদা আলাদা ভাবে ব্যবহার করা হয়। এতে মেন সুইচ থেকে মেন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে দুটো তার আলাদা আলাদা আসে। এই তারগুলোকে হেনলীর তার (Henley's system of wiring) বলে—যে কোম্পানি এই তার দিয়ে বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর প্রচলন করেছে তাদের নামে।

"তার সম্বন্ধে আরও দু-একটা কথা বলে নিই। কেব্‌ল্-এর ভেতর সরু-সরু তামার তার পাকানো আছে এ কথা আগে বলেছি। তারটা যতো সরু হবে, সেটার ভেতর দিয়ে ইলেকটিক গেলে সেটা ততো গরম হয়ে উঠবে। কাজেই যদি বেশি ইলেক-ট্রিক যাওয়াতে হয় তাহলে তারটাকে বেশি মোটা করতে হয়। গোটা গুছির তারটা কতো মোটা তার উপরই নির্ভর করে তারের

গরম হওয়া,—গুছির সরু-সরু তারগুলোর উপর নয়। গুছিটা দুভাবে মোটা করতে পারা যায় : ১) গুছির তারগুলো মোটা-মোটা করে, ২) গুছিতে তারের সংখ্যা বাড়িয়ে। এই দুরকম ব্যবস্থাই করা হয়। বাড়ির ইলেকট্রিকের তার মোটামুটি এই রকম :

গুছিতে কটা তার আছে	গুছির প্রতি তারের ব্যাস	কতো ইলেকট্রিক গুছিতে যেতে পারে
১	·০৪৪ ইঞ্চি	১১০০ ওয়াট
৩	·০২৯ ”	১১০০ ওয়াট
৩	·০৩৬ ”	২২০০ ওয়াট
৭	·০২৯ ”	৩৩০০ ওয়াট

"এই তারগুলো সঙ্কেতে লিখতে হলে লেখা হয় ১/·০৪৪; ৩/·০৩৬ ইত্যাদি, অর্থাৎ গুছিতে কটা তার আছে আর প্রতি তারের ব্যাস কতো,—এই দুটো সংখ্যা দিয়েই তারটাকে বোঝানো হয়।

"তার অবশ্য ৭/·০২৯-এর থেকেও মোটা হয়। তবে সাধারণ বাড়িতে ৭/·০২৯-এর থেকে মোটা তার বড়ো লাগে না।

"মেন সুইচ থেকে যে তারটা মেন ডিস্ট্রিবিউশন বক্স অবধি এসেছে সে তারটাকে বলে মেন তার ; এই মেন তার সাধারণত ৭/·০২৯ মাপের।

"আচ্ছা এইবার দেখা যাক মেন ডিস্ট্রিবিউশন বক্সের খবর।

কিন্তু ৪৯ নম্বর পাতার ছবিটার সঙ্গে ভালো করে মিলিয়ে মিলিয়ে না বুঝলে ব্যাপারটা বোঝা খুব কঠিন হবে।

ডিস্ট্রিবিউসন্ বক্স-এর ভেতর আছে দুটো পেতল বা অন্য কোনো ধাতুর দুটো ছোটো লাঠি ; এই লাঠি দুটোয় 'মেন'-এর ঠাণ্ডা আর গরম তার লাগানো আছে, কাজেই এই লাঠি দুটোকেও ঠাণ্ডা লাঠি আর গরম লাঠি বলতে পারা যায়। গরম লাঠির উপর সাজানো আছে একসার ফিউজের হোলডার—সেগুলোর সংখ্যা নির্ভর করে ব্যবহারের উপর। আমাদের এই বাড়িটি ছোটো, আমাদের মেন ডিস্ট্রিবিউশন বক্সে মাত্র তিনটি হোলডার আছে।

"ডিস্ট্রিবিউশন বক্সে যে-কটা হোলডার থাকে ততো জোড়া তার ঐ বাক্সটা থেকে বেরোয়। প্রত্যেক জোড়া তারের কালো তারটা লাগানো থাকে ঠাণ্ডা লাঠিটায় আর লাল তারটা একটা ফিউজ-হোলডারের মারফত লাগানো থাকে গরম লাঠিটায়। আবার মনে করিয়ে দিই যে, আমাদের বাড়ির সব তারই এল-সি (L.C.), তার মানে মেন ডিস্ট্রিবিউশন বক্স থেকে প্রতিজোড়া তার একত্রে সিসে-মোড়া হয়ে বেরিয়েছে।

"এই ডানদিকের তারজোড়ার কথাই ধরা যাক : লাল তারটা মেন ডিস্ট্রিবিউশন বক্সের হোলডারের ফিউজ মারফত গরম লাঠিতে লাগানো আছে। সেই গরম লাঠিটা আবার মেনের তারের গরম লাল তার ও মেনের ফিউজ মারফত কোম্পানির ব্যাটারির আর্থ-না-করা প্রান্তে লাগানো আছে ;

আর মেন ডিস্ট্রিবিউশন বক্সে ডানদিকের তার-জোড়ার কালো তারটা কোম্পানির ব্যাটারির আর্থ-করা প্রান্তে লাগানো আছে। কাজেই এখন যদি একটা বাল্‌ব্ লাগাস্ এই ডানদিকের তার-জোড়ায়, তাহলে কোম্পানির ব্যাটারি থেকে ইলেকট্রিক এসে এই বাল্‌ব্‌টা জ্বালাবে। তার জন্যে আর একটু ব্যবস্থা চাই।

"ডানদিকের তার জোড়াটা পাশের ঘরে চলে গেছে : সেখানে দেওয়ালের উপর দিকে তারের উপর একটা ছোটো কাঠের বাক্স মতন বসানো আছে। ঐ বাক্সটার নাম জাংশন্ বক্স (Junction Box) বা তার-জোড়া-দেওয়ার বাক্স। ভোঁদা, মেন স্যুইচ বন্ধ করে দে তো, আর ফটকে, ধর তো মইটা এখানে, জাংশন বাক্সটা খুলে দেখাই কী আছে ওর ভেতর।

জাংশন্ বক্সের দুরঙা ছবি পাওয়া যাবে ৫১ পাতায়—সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়তে হবে।

"এই যে সাদা সাদা কাঁচের মতো দেখতে, এগুলোকে বলে কনেক্‌টার (Connector) বা সংযোজক ; এরা তার জোড় দেয়। এদের উপরটা কাঁচ বা চিনামাটির আর ভেতরে একটা লোহার নল আছে, সেই নলের আবার দুধারে দুটো ইস্‌ক্রুপ আছে। নলটার দুদিকে দুটো তার ঢুকিয়ে ইস্‌ক্রুপ টাইট দিলেই তার দুটো জোড়া হয়ে গেলো।

"এই ঘরে দুটো আলো আছে আর একটা প্লাগ আছে ; আর পাশের ঘরেও দুটো আলো আর একটা প্লাগ আছে। এই সব-

কটাই জাংশন বাক্স মারফত মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের ডান দিকের তার জোড়ার সঙ্গে লাগানো আছে।

"আগে একটা আলো কী করে লাগানো হয়েছে দেখাই। জাংশন বাক্সে ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে এক জোড়া তার এসেছে ; এই তার-জোড়ার ঠাণ্ডা তারটা অর্থাৎ কালো তারটা চলে গেছে হোলডারে। ছাদ-বরাবর দেখ, এক-জোড়া তার গেছে ; এই তারজোড়ার কালো তারটা একটা সংযোজক দিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন-বাক্স-থেকে-আসা ঠাণ্ডা তারটায় লাগানো থাকে। আর ছাদ-থেকে-আসা তার-জোড়ার লাল তারটা আর একটা সংযোজক দিয়ে অন্য আর-এক জোড়া তারের একটাতে লাগানো থাকে। এই তার জোড়াটা চলে গেছে সুইচে ; সুইচ থেকে ফিরে এসে আবার আর-একটা সংযোজক দিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন-বাক্স-থেকে-আসা তার জোড়ার লাল তারটায় লাগানো থাকে।"

ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার জন্যে ৫২ পাতার ছবিটার সঙ্গে ভালো করে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়তে হবে।

ভোঁদা বললে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব গোলমাল হয়ে গেলো, কটা তার আর কটা সংযোজক আছে জাংশন বাক্সে ?"

খোকন বললে, "জাংশন বাক্সে ঢুকেছে তিন জোড়া তার। প্রথম জোড়া এসেছে ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে, দ্বিতীয় জোড়া ছাত বেয়ে বাল্‌বে গেছে আর তৃতীয় জোড়া দেওয়াল বেয়ে গেছে সুইচে। এই তিন জোড়া তারের ছটা মুখ তিনটে সংযোজক

দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে লাগানো হয়েছে : ডিস্ট্রিবিউশন-বাক্স-থেকে-আসা তার-জোড়ার লালতারটা লাগানো আছে সুইচ-থেকে-আসা তার-জোড়ার একটাতে, আর কালো তারটা লাগানো আছে বাল্‌ব্ থেকে-আসা তার-জোড়ার কালো তারটায় ; বাল্‌ব্-থেকে-আসা তার-জোড়ার লাল তারটা সুইচ-থেকে-আসা তার জোড়ার অন্য তারটায় লাগানো আছে।

"সুইচে কী আছে সে কথা তো আগেই বলেছি। যে-তার-জোড়া ছাত বেয়ে বাল্‌বে গেছে সে-জোড়াটা গিয়ে প্রথমে লেগেছে ছাতের গায়ে লাগানো একটা বাটিতে, এই বাটিটার কিন্তু ভারি সুন্দর নাম : ওকে বলে ছাদের গোলাপ বা সিলিং-রোজ (Ceiling Rose)। এটার ভেতরে আসলে কিছু ভজঘট নেই : সিসে-ঢাকা তার জোড়ার দুটো তার আলাদা আলাদা করে দুটো ধাতুর মুণ্ডিতে ইস্‌ক্রুপ দিয়ে লাগানো আছে !

"সিলিং রোজের বাইরে ঝুলছে খানিকটা তার, যাকে বলে ফ্লেক্‌সিব্‌ল তার (flexible wire) বা নমনীয় তার। নমনীয় তার আর কিছু হাতিঘোড়া নয় ; এল-সি তারের সিসের খোসাটা ফেলে দিয়ে যদি লাল আর কালো তার দুটোকে বিনুনি পাকানোর মতো জড়াই তাহলেই নমনীয় তার পাবো ; অবশ্য আসল নমনীয় তারে আর-একটু বিশেষত্ব আছে। এল-সি তারের গুছিতে সাধারণত ১টা, ৩টে বা ৭টা তার থাকে —একথা আগেই বলেছি। কিন্তু নমনীয় তারের গুছিতে ১৪, ২৩, ৪০, ১১০ বা ১৪০টা তার থাকে, আর সেগুলোর প্রত্যেকটা খুব সূক্ষ্ম : মাত্র ·০০৭৬ ইঞ্চি ব্যাস প্রত্যেকটা তারের।

তাছাড়া উপরের রবারটাও খুব নরম থাকে আর লাল ও কালো তার দুটোর ওপর আলাদা আলাদা ভাবে সিল্কের খোলস জড়ানো থাকে। (৪০ পাতার ছবি দেখ)

"সিলিং রোজ থেকে নমনীয় তারটা বেরিয়ে গেছে বাল্‌বের হোলডারে। হোলডারের ভেতরেও আছে দুটো ধাতুর মুণ্ডি, তার সঙ্গে নমনীয় তার-জোড়ার তার-দুটো আলাদা আলাদা করে লাগানো আছে। যখন হোলডারে বাল্‌ব্‌ লাগানো হয়
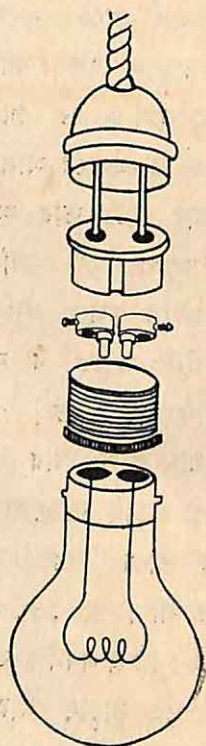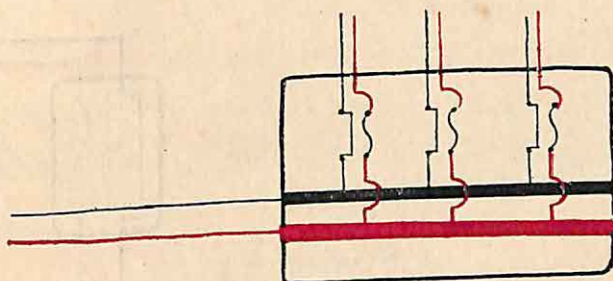
মেন ডিস্ট্রিবিউশন বক্স

মেনের লাল আর কালো তার এসেছে ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের পেতলের দুটো লাঠিতে। এই লাঠিজোড়া থেকে তিন জোড়া ঠাণ্ডা-গরম তার বেরিয়েছে। প্রত্যেক গরম তারে ফিউজ আছে।

●—গরম তার

●—ঠাণ্ডা তার
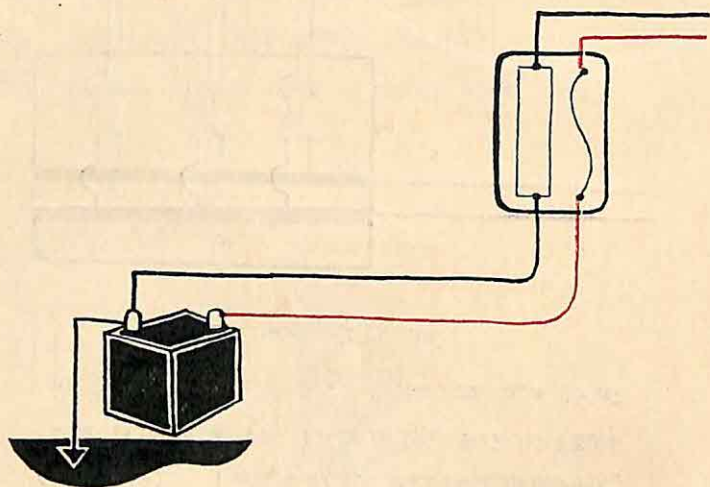
মেন স্যুইচের ভেতর গরম তারে ফিউজ লাগানো থাকে আর ঠাণ্ডা তারে তামার পাত। গরম তারটা থাকে লাল রবার মোড়া আর ঠাণ্ডা তারটা কালো রবার মোড়া।
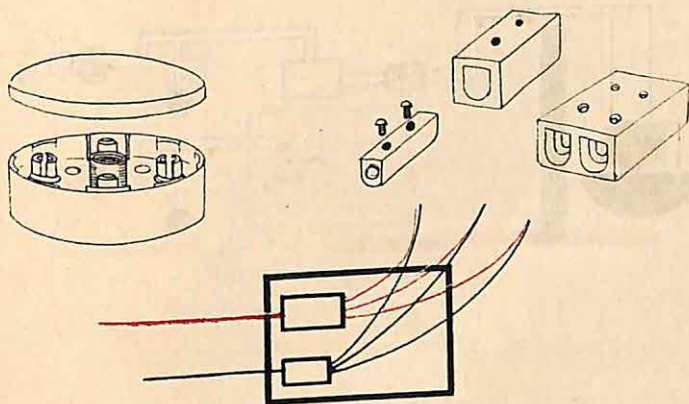
নিচের ছবিতে কাঠের জংসন বাক্স। এর ভেতর দুটো সংযোজক আছে। সংযোজকের ছবি ওপরে ডান দিকে দিয়েছি ; ওপরের ছবি হলো কেবল ঠাণ্ডা বা গরম তার লাগানোর সংযোজক। আর যদি একটা সংযোজকেই ঠাণ্ডা ও গরম দু'রকম তার লাগাতে চাও তো ডানদিকের নিচের ছবির সংযোজক ব্যবহার করো।

ওপরের বাঁদিকের ছবি হলো প্লাস্টিকের জাংসন বাক্স ; এর ভেতর একেবারে সংযোজক লাগানোই থাকে, আলাদা সংযোজক আর লাগে না।
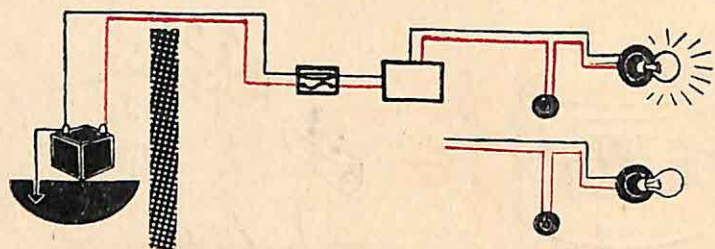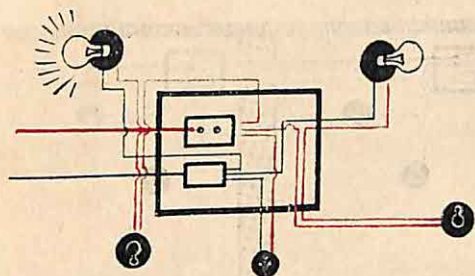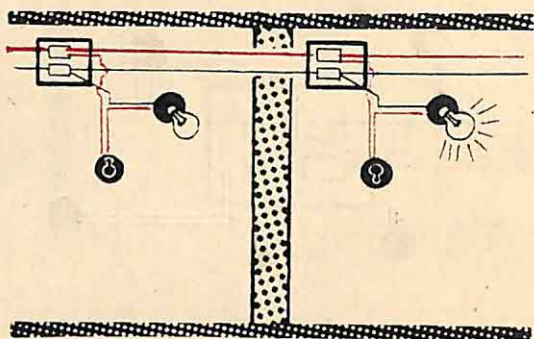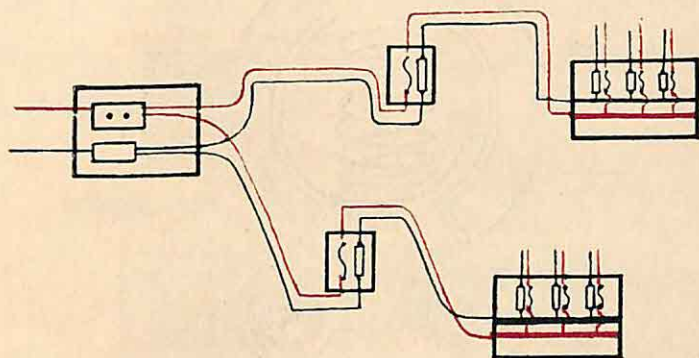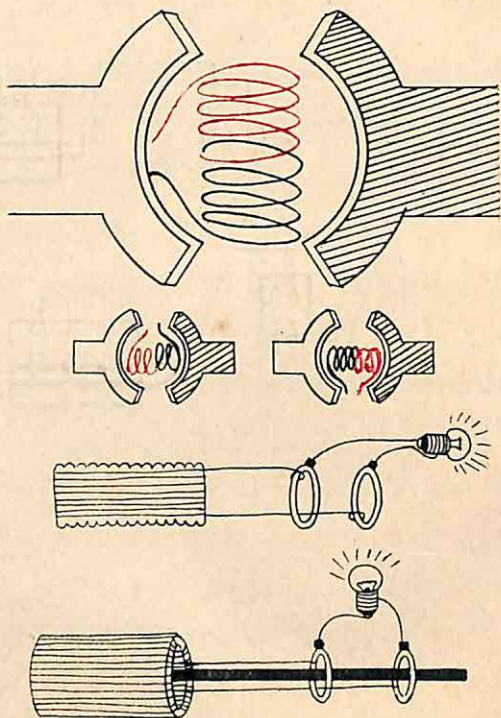
ওপরের বড়ো ছবি ও তার পরের ছবি দুটোতে এ. সি. কারেন্ট তৈরি বোঝানো হয়েছে। (১০৯ পৃষ্ঠা দেখো)।
নিচের ছবি দুটোয় কমিউটেটার বদলিয়ে রিং দিয়ে আর্মেচার থেকে এ. সি. কারেন্ট পাবার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। (১১৬—১১৯ পৃষ্ঠা দেখো)।

তখন বাল্‌বের তলায় উঁচু উঁচু ধাতুদুটো এই হোল্‌ডারের মুণ্ডি দুটোয় ঠেকে থাকে।

"বাল্‌ব্‌টা আসলে আর কিছু নয়, কাঁচের ডুমোয় পোরা খুব সরু খানিকটা তার। এই তারের দুটো মাথা বাল্‌বের তলার ধাতু দুটোয় লাগানো আছে। বাল্‌বের ভেতর দিয়ে যখন ইলেকট্রিক যায় তখন বাল্‌বের তার গরম হতে হতে একেবারে সাদা ধবধবে হয়ে ওঠে,—কাজেই আলো পাওয়া যায়।

"এইবারে দেখ সুইচ জ্বাললে কী হয়? কোম্পানির

ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে ৫২ পাতার দুরঙা ছবিটিকে হুঁশিয়ার হয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

ব্যাটারির আর্থ-না-করা প্রান্ত থেকে কোম্পানির তার বেয়ে আমাদের বাড়ির মেন সুইচের ফিউজ ও মেনের গরম তার বেয়ে, মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের গরম লাঠি ও ফিউজ হয়ে জাংশন বাক্সের সংযোজক মারফত ইলেকট্রিক সুইচ হয়ে আবার সংযোজক মারফত ছাদের তার, নমনীয় তার বেয়ে চলে গেলো—কোম্পানির ব্যাটারির আর্থ-করা প্রান্তে। কিন্তু যদি সুইচ নেভানো থাকে তাহলে আর বাল্‌ব্‌ জ্বলবে না, কারণ ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে ইলেকট্রিক আর নেগেটিভ প্রান্তে যাবে কী করে—মাঝে যে সুইচটার ভেতরে তারে ফাঁক রয়ে গেছে!

“একটা আলোর জন্যে জাংশন বাক্সে তিনজোড়া তার লেগেছে। যদি তুটো আলো আর একটা প্লাগ থাকে তাহলে কটা তার কীভাবে লাগবে একটা ছবি এঁকে বোঝাচ্ছি।

> ছবিটা দেখতে পাবে ৫৩ পাতায়, লাল আর কালো তারের মধ্যে কোনটে ঠাণ্ডা আর কোনটে গরম তা ভালো করে মনে রেখো।

“দ্বিতীয় আলোটার জন্যেও প্রথম আলোটার মতোই, একজোড়া তার গেছে বাল্‌ব্‌-হোলডারে আর একজোড়া গেছে এই দ্বিতীয় আলোর সুইচে। আমাদের বাড়িতে প্লাগের কিন্তু সুইচ নেই, কাজেই প্লাগের জন্যে মাত্র একজোড়া তারই এসেছে।”

ভোঁদা বললে, “মণ্টেদের বাড়িতে প্লাগের সুইচ আছে, ওদের বাড়িতে কি তাহলে প্লাগের জন্যে তুজোড়া তার লাগে?”

খোকন বললে, “না, প্লাগের জন্যে জাংশন বাক্স থেকে সবসময়ই মাত্র একজোড়া তার আসে, প্লাগের সুইচ থাকলে এই তারজোড়ার একটা তার প্লাগের একটা ফুটোয় সোজা চলে যায়, আর অন্য তারটা সুইচের ভেতর দিয়ে প্লাগের অন্য ফুটোয় চলে যায়। সুইচ কিন্তু থাকে লাল তারে, অর্থাৎ গরম তারে। প্লাগে যদি একটা বাল্‌ব্‌ লাগাই হোলডার আর প্লাগের পিন দিয়ে”...

ফটকে বললে, “প্লাগের পিন কী?”

ভোঁদা বললে, “তাও জানিস না? প্লাগের ভেতর গুঁজে

দেয় যে কাঠের গুলিটা,—যার গায়ে পেতলের দুটি লাঠি আছে,—ওই যে-দুটো লাঠি প্লাগের ছ্যাদায় ঢুকে পড়ে—সেই গুলিটাকে বলে প্লাগের পিন ; নয় খোকনদা ?"
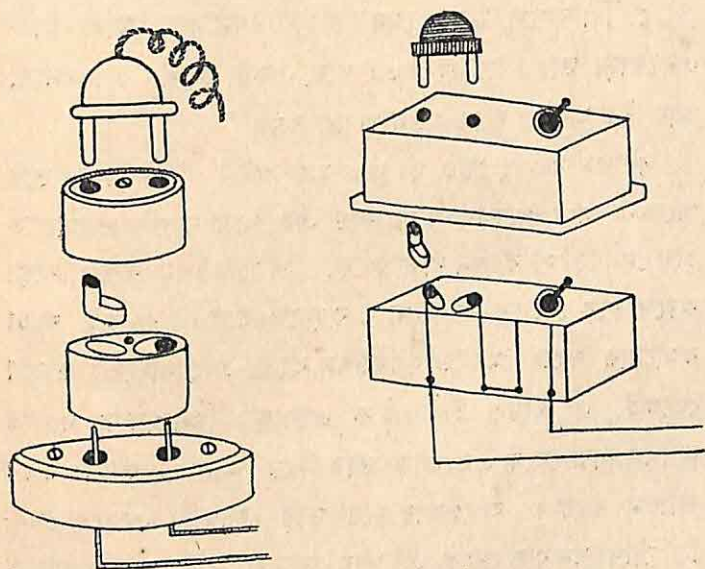
খোকন বললে, "হ্যাঁ, তবে প্লাগ কাঠ ছাড়াও প্লাসটিক বা অন্য জিনিসের হয়। কিন্তু যা বলছিলাম। প্লাগে যদি একটা বাল্‌ব্ লাগাই হোলডার আর প্লাগের পিন দিয়ে, তাহলে প্লাগের স্থইচ টানলে কেন আলো জ্বলবে বল দিকি ?

"দুটো আলো আর একটা প্লাগের জন্যে তাহলে জাংশন বাক্সে তার ঢুকবে ছজোড়া, একজোড়া এসেছে মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে, দুজোড়া গেছে দুটো বাল্‌বের হোলডারে, দুজোড়া দুটো স্থইচে আর একজোড়া গেছে প্লাগে।

"আচ্ছা, চল পাশের ঘরে। এই পাশের ঘরেও দুটো আলো আর একটা প্লাগ আছে। কী করে এগুলোয় ইলেকট্রিক আনা যায় বল দিকি ?"

ভোঁদা বললে, "কেন, মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে আর-একজোড়া তার নিয়ে এসো এই ঘরে, একটা জাংশন বাক্স বসাও, আর ঠিক আগের ঘরের মতন ব্যবস্থা করো।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ, তা করা যায় বটে। কিন্তু তাতে তার অনেক লাগবে, প্রত্যেক ঘরের জন্যে একজোড়া করে তার আনতে হবে মেন-ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে, ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সও বড়ো করতে হবে, হোলডারের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। কাজেই খরচা কমানোর জন্যে মেন-ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সে ঐ ডানদিকের তারটা থেকেই এ ঘরেও ইলেকট্রিক এসেছে। আগেকার ঘরটার জাংশন বাক্স থেকে একজোড়া তার নিয়ে আসা হলো এ-ঘরের জাংশন বাক্সে। আগেকার ঘরে তার জোড়াটা এসেছে মেন-ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে, এই তার জোড়াটা সেটার সঙ্গে সংযোজক দিয়ে জোড়া আছে, অর্থাৎ এই তার জোড়াটার লাল তারটা ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের তারের লালটার সঙ্গে, আর কালোটা ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের তারের কালোটার সঙ্গে জোড়া আছে।

> ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে হলে ৫৪ নম্বর পাতার দু-রঙা ছবিটাকে মন দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

"এইবারে এই ঘরে দুটো আলো আর একটা প্লাগ ঠিক আগেকার ঘরের মতো করে বসানো হলো। এ ঘরের জাংশন বাক্সেও ছজোড়া তার ঢুকেছে, একজোড়া এসেছে আগেকার ঘরের জাংশন বাক্স থেকে, দুজোড়া গেছে দুটো আলোর হোলডারে, দুজোড়া গেছে দুটো সুইচে, আর শেষ জোড়াটা প্লাগে।

"যদি এই ঘরে একটা আলোর সুইচ টিপি, তাহলে কোম্পানির বাড়ির ব্যাটারি থেকে কোম্পানির তার বেয়ে মেন-সুইচের তার দিয়ে মেন ডিস্ট্রিবিউশনের তার হয়ে পাশের ঘরের জাংশন বাক্স ঘুরে এই ঘরের জাংশন বাক্সের ভেতর দিয়ে আলোর সুইচ মারফত ইলেকট্রিক এ-ঘরের বাল্‌ব্ পর্যন্ত যাবে। গিয়ে বাল্‌ব্ জ্বলাবে।

"কাজেই দেখ, এই রকম ভাবে মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে বেরোনো একজোড়া তারেই যতোগুলো ঘরে খুশি আলো জ্বালানো যায়।"

ভোঁদা বললে, "যতোগুলো ঘরে খুশি কী করে হবে? ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে আসা একজোড়া তার দিয়ে মোটে তো দুটো ঘরে আলো জ্বালার কথা বললে।"

ফটকে বললে, "আরে বোকা, তৃতীয় ঘরে ইলেকট্রিক নিয়ে যেতে হলে, এই দ্বিতীয় ঘরের জাংশন বাক্স থেকে তৃতীয় ঘরের জাংশন বাক্সে একজোড়া তার নিয়ে যা, চতুর্থ ঘরে আবার তৃতীয় ঘরের জাংশন বাক্স থেকে একজোড়া তার নিয়ে যা, এই রকম আর কি,—না খোকনদা?"

খোকন বললে, "ঠিক বলেছিস।

"আচ্ছা, এইবারে চল তো আবার মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের কাছে ফিরে যাই।

"মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের ডানদিকের তার জোড়ার কথা এতোক্ষণ বললাম। বাঁদিকের তার জোড়া গেছে ঐদিকে ছোট-কাকা, মেজকাকা আর পিসিমার ঘরে। প্রত্যেক ঘরে একটা করে জাংশন বাক্স আছে আর আলো-প্লাগ ইত্যাদির তার ঐ জাংশন বাক্স মারফত ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের বাঁদিকের তার জোড়ার সঙ্গে লাগানো আছে—ঠিক যেরকম ভাবে আগের ঘরগুলোর বেলায় ছিলো।

"ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের মাঝের তারজোড়া একতলার ছাদ ফুঁড়ে দোতলায় গেছে। চল দোতলায় গিয়ে দেখি তারজোড়া কোথায় গেলো।"

দোতলায় এসে ভোঁদা বললে, "এই তো তারজোড়া ওপরে এসেছে, কিন্তু দোতলার মেঝে থেকে খানিকটা অবধি একটা কালো নল লাগানো কেন?"

খোকন বললে, "ঐ নল বা পাইপটা লোহার, ওটাকে বলে কনডুইট্ (conduit)। একতলার ছাত ফুঁড়ে দোতলার মেঝে থেকে চার-পাঁচ ফুট উঁচু অবধি এই কনডুইট্টা থাকে আর একতলা থেকে দোতলায় তার জোড়া এসেছে এই কনডুইটের ভেতর দিয়ে।"

ফটকে বললে, "কনডুইট্টা দেয় কেন?"

খোকন বললে, "দোতলায় মেঝের কাছের তার যাতে ধাক্কা

লেগে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্যে—অর্থাৎ তারজোড়া রক্ষা করার জন্যেই এই শক্ত লোহার নলটা দেওয়া হয়।

"কনডুইটের ভেতর থেকে তারজোড়া বেরিয়ে এসে আর একটা ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সে গেছে ; এইটাকে দ্বিতীয় বা অপ্রধান ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স বলতে পারা যায়। এটার ভেতরটা ঠিক মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের মতো, এর ভেতরেও দুটো ধাতুর লাঠি আর কয়েকটা ফিউজ-দেওয়া হোলডার আছে। এই দ্বিতীয় ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকেও কয়েকজোড়া তার বেরিয়ে গেছে আর সেই তারগুলো দোতলার ঘরে গিয়ে জাংশন বাক্সের মারফত আলো জ্বালছে। দোতলায় ঠাকুরমার ঘরের একটা আলোর সুইচ যদি জ্বালি, তাহলে কোম্পানির ব্যাটারি থেকে আমাদের বাড়ির প্রধান ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের মাঝের তারজোড়া দিয়ে, দ্বিতীয় ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স হয়ে, সেখানে থেকে বেরোনো তার-জোড়াদের একজোড়া বেয়ে, ঠাকুরমার ঘরের জাংশন বাক্স ঘুরে, সুইচ হয়ে, বাল্‌বে গিয়ে আলো জ্বালবে।"

ভোঁদা বললে, "বাড়িতে ইলেকট্রিক কী করে তার বেয়ে আসে বুঝলাম। মেন সুইচের ভেতর কেন ফিউজ-তার দিয়েছে তা তো বললে ; কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের ভেতর কেন ফিউজ-তার দিয়েছে তা তো বললে না ?"

খোকন বললে, "বলছি, তার আগে আর-একটা কথা বলে নিই।

"সব বাড়িতেই মেনের তার জোড়াটা অন্য তারের চেয়ে মোটা দেওয়া হয়। আমাদের বাড়িতে মেনের তার হচ্ছে ৭/·০২৯ ;

মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে দোতালায় দ্বিতীয় ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সে যে তার-জোড়া গেছে তাদের মাপ হলো ৩/·০৩৬; আর অন্য সব তার হলো ৩/·০২৯ মাপের। তার মানে, মেন তারে ৩৩০০ ওয়াট ইলেকট্রিক যেতে পারে, দুটো ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের মাঝের তারে ২২০০ ওয়াট আর অন্য সব তারে ১১০০ ওয়াট ইলেকট্রিক যেতে পারে।

"ধর, সারা বাড়িতে কেবল মাত্র ছোটকাকার ঘরে দুটো ৪০০ ওয়াট করে আলো আর পিসিমার ঘরে দুটো ৪০০ ওয়াট করে আলো জ্বলছে, আর সারা বাড়িতে কোন আলো জ্বলছে না। তাহলে সবশুদ্ধ ১৬০০ ওয়াটের ইলেকট্রিক আসবে কোম্পানির ব্যাটারি থেকে আমাদের বাড়ির মেন তার হয়ে। ৩৩০০ ওয়াট অবধি ইলেকট্রিক গেলেও মেন তার জোড়া বেশি গরম হয় না, কাজেই ১৬০০ ওয়াটে মেন তার গরম হবে না, আর মেনের ফিউজও পুড়বে না। কিন্তু মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের বাঁদিকের তার-জোড়ার বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকম হবে। এই তার-জোড়া বেয়েই ছোটকাকা আর পিসিমার ঘরে ইলেকট্রিক যাচ্ছে একথা আগেই বলেছি। কাজেই ঐ ১৬০০ ওয়াট ইলেকট্রিকই এই তার জোড়া দিয়ে যাবে; কিন্তু এই তার জোড়া যে মাত্র ১১০০ ওয়াট রাখতে পারে; কাজেই বেশি ইলেকট্রিক যাওয়ার ফলে তার জোড়াটা পুড়ে যাবে। যাতে এই রকম ভাবে পুড়ে না যায় সেই জন্যেই ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সে ফিউজ দেওয়া থাকে। দেখ, এই তার জোড়ায় ইলেকট্রিক যাচ্ছে মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের বাঁদিকের হোলডারের ফিউজ মারফত।

পিছু হটে ৪৯ পাতার
ছবিটা দেখে নাও

এই ফিউজ যদি এমন মাপের দেওয়া হয় যে ১১০০ ওয়াটের বেশি ইলেকট্রিক গেলে ফিউজটা পুড়ে যাবে তাহলে ছোটকা আর পিসিমা যুক্তি করে বেশি জোরালো আলো লাগালেও তার পুড়বে না, ফিউজ পুড়ে যাবে।

"তার যেমন সরু-মোটা হয়, তেমনি ফিউজও সরু-মোটা হয়। ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের হোলডারগুলোয় মাপসই ফিউজ লাগালে তার না পুড়ে ফিউজই পুড়বে। কিন্তু বেমাপের ফিউজ লাগালে বিপদ। ধর, এই আমাদের বাড়ির মেন ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সের বাঁদিকের হোলডারে যদি মেন সুইচের ফিউজ লাগানো থাকতো তাহলে কী হতো বল দিকিনি?"

ফটকে বললে, "তাহলে ছোটকাকা আর পিসিমা ১৬০০ ওয়াটের আলো জ্বালালে ফিউজটা পুড়তো না, কারণ ওটা তো মেনের ফিউজ,—৩৩০০ ওয়াটের বেশি না গেলে পোড়ে না। কাজেই তারই পুড়ে যেতো, ফিউজ যেমন তেমনই থাকতো—না খোকনদা?"

খোকন বললে, "হ্যাঁ ঠিক বলেছিস।"

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা সব বাড়িতেই কি ঠিক এই রকম ভাবে তার লাগানো থাকে?"

খোকন বললে, "হ্যাঁ রীতিটা এই রকমই, তবে পদ্ধতির তফাত আছে। আমাদের বাড়িতে কোনো ঘরে ইলেকট্রিকের কাজ

করতে হলে, মেন সুইচ বন্ধ করে সারা বাড়ি অন্ধকার করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু মণ্টেদের বাড়ি তা করতে হয় না। ওদের বাড়ি বড়ো বলে ওরা একটু বেশি খরচা করে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থাটা একটু ভালো করেছে।

"ওদের বাড়ি মেন সুইচ থেকে মেনের তার এসেছে একটা জাংশন বাক্সে; সেখান থেকে দু জোড়া তার বেরিয়ে গেছে: প্রথম জোড়াটা গেছে একতলায় ডিষ্ট্রিবিউশন বাক্সে, কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সে যাবার আগে আর একটা সুইচের ভেতর দিয়ে গেছে। এইটাকে একতলার মেন সুইচ বলতে পারিস, যদিও এর আসল নাম হচ্ছে সুইচ-ফিউজ (switch fuse)। এই সুইচ-ফিউজের ভেতরের চেহারা ঠিক মেন সুইচের মতোই, একটা ফিউজ দেওয়া আছে হোলডারে, গরম তারটা গেছে হোলডার মারফত আর ঠাণ্ডা তারে কোনো ফিউজ নেই, একতলার ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে হোলডার মারফত তার বেরিয়ে একতলার ঘরগুলোয় গেছে যেমন আমাদের বাড়িতে গেছে।

"মেনের তার যে-জাংশন-বাক্সে গেছে সেখান থেকে দ্বিতীয় জোড়া যে-তার বেরিয়েছে, সে-জোড়াটা গেছে দোতালায়। সেখানে আর-একটা সুইচ-ফিউজ মারফত দোতালায় ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সে গেছে। দোতালার ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স থেকে হোলডার মারফত তার দোতালার ঘরে গেছে।

৫৫ পাতার তুরঙা ছবিটা দেখে নাও

"এই ব্যবস্থার সুবিধা হচ্ছে একতলার সুইচ-ফিউজ বন্ধ করলে একতলার ডিস্ট্রিবিউশন বাক্সে ইলেকট্রিক যেতে পারে না, কাজেই একতলায় কোনো আলো জ্বলে না ; কিন্তু দোতলার আলো ঠিকই জ্বলবে। তেমনি দোতালার সুইচ-ফিউজ নেভালে কেবল দোতালার আলোই নিভবে, একতলার আলো ঠিকই জ্বলবে।"

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা আলো কী করে জ্বলে সেকথা তো বললে, কিন্তু পাখা কী করে ঘোরে সে কথা তো কই বললে না ?"

খোকন বললে, "সে-কথা বলার আগে ইলেকট্রিকের রূপগুণ আরও একটু বিশদ করে বলতে হবে। আজ বকে-বকে গলা শুকিয়ে গেছে। সে কথা কাল বলবো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
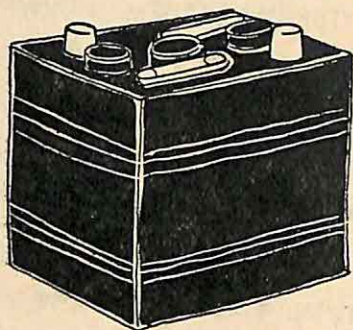
পরের দিন খোকন গল্প শুরু করলো একটা পরীক্ষা দিয়ে। একটা লম্বা গোল টিনের কৌটোর নিচের দিকে ছ্যাঁদা করে একটা সরু টিনের নল রাঙঝাল দিয়ে লাগিয়ে নিয়ে এসেছে রাঙমিস্ত্রির কাছ থেকে। সেই টিনের কৌটোটা নিয়ে বেশ বিজ্ঞের মতো খোকন বললে, "ভোঁদা এই টিনের ভেতর জল ঢাল দিকি খানিকটা, আমি ততোক্ষণ নলের মুখটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরি। (৬৯ পাতায় ছবি) জল ঢেলে স্কেল ডুবিয়ে দেখ তো, ইঞ্চি চারেক গভীর হয়েছে কিনা। চার ইঞ্চি গভীর হয়েছে ? আচ্ছা, এইবার আমি আঙুল সরিয়ে নিলাম, কী হলো দেখ দিকি ?"

ফটকে বললে, "ফুঃ, ভারী তো পরীক্ষা ! নল দিয়ে জলটা ছচ্ছড় করে বেরিয়ে গেলো।"
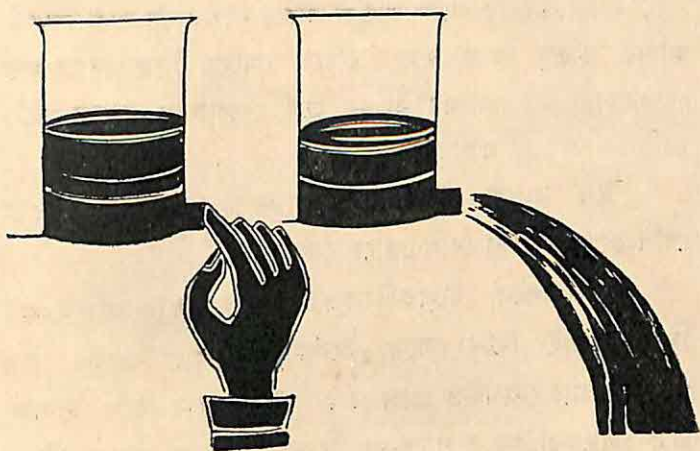
খোকন ভ্রূক্ষেপও না করে ভোঁদাকে বললে, "নে আবার জল ঢাল টিনের কৌটোটায়; আমি আবার নলটা বন্ধ করে দিচ্ছি; কিন্তু এইবার জল বেশি ঢালবি, গভীরতা যেন আট ইঞ্চি হয়।
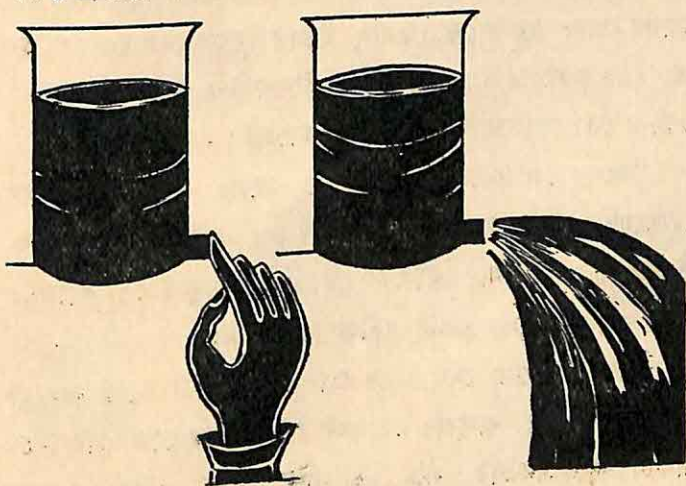
"আচ্ছা এইবার আমি আঙুল সরিয়ে নলের মুখ খুলে দিতেই আবার ছস্ছড় করে জল বেরিয়ে গেলো, কিন্তু এবারে জল বেরোনোর হার আগের বারের জল বেরোনোর হারের থেকে বেশি। তাই না ফটকে ?"

ফটকে বললে, "এ আর কে না জানে ? জলের গভীরতা বেশি হলে জল তো বেশি তোড়ে বেরোবেই।"

খোকন বললে, "ইলেকট্রিকের বেলায় অনেকটা এই রকমই নিয়ম। এই টর্চের সেলে ইলেকট্রিক পোরা আছে ; কিন্তু পজিটিভ আর নেগেটিভ প্রান্ত তার দিয়ে জুড়ে না দিলে ইলেকট্রিক চলাফেরা করতে পারে না, যেমন নল থেকে আঙুল সরিয়ে না নিলে টিনের কৌটোর জল বেরোতে পারে না, কৌটোতেই থেকে যায়। জল যেমন নল দিয়ে বয়ে যায়, তেমনি ইলেকট্রিকও তার দিয়ে বয়ে যায়। জলের বেলায় যেমন বলতে পারিস নল বেয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তেমনি ইলেকট্রিকের বেলায়ও বলা হয় তার বেয়ে ইলেকট্রিকের স্রোত বা ইলেকট্রিক কারেণ্ট যাচ্ছে,— জানিস তো স্রোতের ইংরাজি হলো কারেণ্ট (current)।

"জলের বেলায় যেমন কৌটোটায় জলের গভীরতা বাড়িয়ে দেখিয়েছি নল বেয়ে জল বেরোনোর হার বাড়ে, তেমনি ইলেকট্রিকের বেলায় যদি ইলেকট্রিকের জোর বাড়াই তো কারেণ্টও বেশি যাবে। এটা একটা পরীক্ষা করে দেখাই।

"একটা টর্চের সেল নিয়ে তার দিয়ে একটা টর্চের বাল্‌বের সঙ্গে লাগালাম। বাল্‌বটা তো জ্বলবে। এখন দুটো সেল নিয়ে একটা আর-একটার সঙ্গে জুড়লাম তার দিয়ে, তারপর
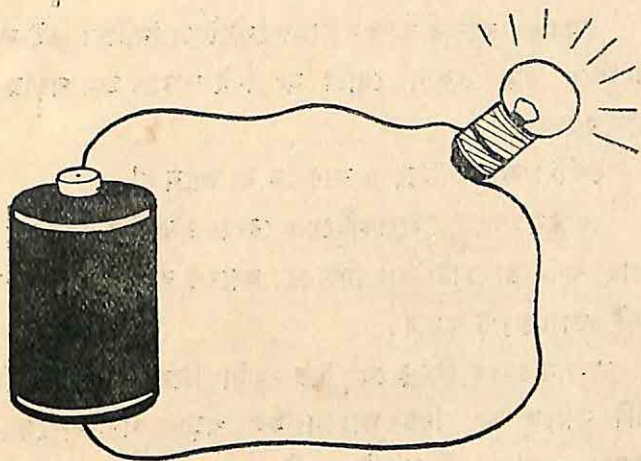
বাল্‌বের সঙ্গে লাগালাম। দেখ, বাল্‌ব্ এবারে বেশি জোরে জ্বলছে। বেশি জোরে বাল্‌ব্ জ্বলা মানেই বেশি ইলেকট্রিক যাওয়া অর্থাৎ কারেণ্ট বেড়ে যাওয়া। কাজেই দেখ, যখন একটা সেল দিলাম, অর্থাৎ যখন ইলেকটিকের জোর এক ভোল্ট, তখন যা কারেণ্ট গেলো, যখন দুটো সেল দিলাম, অর্থাৎ যখন ইলেকটিকের জোর বাড়িয়ে দু ভোল্ট করলাম, তখন কারেণ্ট বেড়ে গেলো।
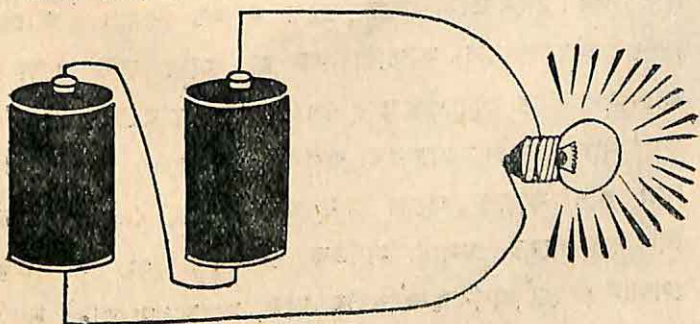
"আচ্ছা, আবার আগের টিনের কৌটোটা নিচ্ছি। এই নলটা বদলিয়ে যদি একটা মোটা নল দিই তাহলে জল পড়ার হার বাড়বে তো ?"

ভোঁদা বললে, "হ্যাঁ, ও আর কে না জানে ?"

খোকন বললে, "ইলেকট্রিকের বেলায়ও তাই-ই হয়। যদি তার বদলিয়ে মোটা তার দিই তো কারেন্ট বাড়বে, রোগা তার দিই তো কারেন্ট কমবে।

"আমার এই টিনের কৌটোর নলটা টিনের, এটা বদলিয়ে যদি কাঁচের নল দিই তাহলে জল পড়ার হার বাড়বেও না কমবেও না। কিন্তু ইলেকট্রিকের বেলায় যদি তামার তার বদলিয়ে রুপোর তার দিই তো কারেন্ট বাড়বে, যদি লোহার তার দিই তো কারেন্ট কমবে—কেননা, লোহার চেয়ে তামা ভালো বাহক, আবার তামার চেয়ে রুপো আরো ভালো বাহক।

ফটকে বললে, "হ্যাঁ, এ-কথাটা তো সেদিন বলছিলে।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ। তাহলে দেখ, তারের ভেতর দিয়ে কারেন্ট কতোটা যাবে তা নির্ভর করে, কী দিয়ে তারটা তৈরী তার ওপর। মানে তামা, লোহা, রুপো না অন্য কিছু। আরও নির্ভর করে, তারটা কতোটা সরু বা মোটা তার ওপর। আর সেল কতো ভোল্টের তার ওপর তো নির্ভর করেই।

"আরও একটা মজার কথা বলে নিই এইবারে। তার যতো লম্বা হবে কারেন্ট ততো কম যাবে। ধর, ভোঁদা গেছে টালীগঞ্জে রাসের মেলায় ম্যাজিক দেখতে। ওঃ, কী ভিড় সেখানে! ভোঁদা কিন্তু হুঁশিয়ার ছেলে, ঘাবড়াবার পাত্রই নয়।

সে করলো কি, মাথাটা নিচু করে গুঁতোতে গুঁতোতে ঢুকে গেলো ভিড়ের ভেতর দিয়ে। কিন্তু ভিড় যদি বেশি হতো, তাহলে ভোঁদা কি আর অতো সহজে যেতে পারতো? প্রাণ বেরিয়ে যেতো না ভেতরে ঢুকতে!

"তারের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট যাওয়াও অনেকটা ভোঁদার ভিড় ঠেলে ভেতরে যাওয়ার মতন : ভিড় যতো বেশি হবে, অর্থাৎ তার যতো লম্বা হবে, কারেন্টেরও ততো কষ্ট হবে যেতে। ভিড় যেমন ভোঁদার 'স্বচ্ছন্দ বিচরণে' বাধা দেয় তেমনি তারটাও কারেন্টকে বাধা দেয়। যদি ইলেকট্রিকের জোর বেশি থাকে তো সে বাধা ঠেলে যেতে পারবে, না হলে আর যেতে পারবে না।

"তার ইলেকট্রিককে কতোখানি বাধা দেয়, সেটারও একটা মাপ আছে। এই বাধাটার নাম হচ্ছে রেজিস্টান্স (resistance)। জানিস তো, বাধা দেওয়ার ইংরাজি হচ্ছে রেজিস্ট (resist); এই রেজিস্ট থেকেই এসেছে রেজিস্টান্স কথাটা।

"কাজেই তারের রেজিস্টান্স বাড়ে তার লম্বা হলে ও সরু হলে; আর বিভিন্ন ধাতুর তৈরি তারের রেজিস্টান্স বিভিন্ন রকমের।

"আগে বলেছি রবারের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক যায় না। কেননা রবারের রেজিস্টান্স বেশি। বাতাসের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক যায় না, কারণ বাতাসের রেজিস্টান্স খুব বেশি। কিন্তু যদি ইলেকট্রিকের জোর বেশি হয় তাহলে রবার বা বাতাসের

রেজিস্টান্স পার হয়েও ইলেকট্রিক কারেন্ট যাবে।

"বাজ পড়া কী জানিস? আকাশের মেঘে অনেক সময় ইলেকট্রিক থাকে, সেই ইলেকট্রিকের জোর খুব বেশি হলে বাতাস ফুঁড়েই মাটিতে ইলেকট্রিক চলে যায়। এই হলো বাজ পড়া—কাজেই মাথায় বাজ পড়লে যে মানুষ মরে যায়, সেটা ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে মরা।

"রেজিস্টান্স মাপার একককে বলে ওম্ (ohm)। ১৯৯ গজ ৭/·০২৯ তামার তারের রেজিস্টান্স এক ওম্; কাজেই ৩৮০ গজ ৭/·০২৯ তামার তারের রেজিস্টান্স দু ওম্। ৩/·০২৯ তার হলো ৭/·০২৯ তারের থেকে সরু, কাজেই ১৯০ গজ ৩/·০২৯ তামার তারের রেজিস্টান্স এক ওমের বেশি।"

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "একটা তারের রেজিস্টান্স কতো ওম্, কী করে জানা যাবে?"

খোকন বললে, "অনেক রকম উপায় আছে। তার ভেতর একটা সোজা উপায় হলো, তারটা ব্যাটারিতে লাগিয়ে কতোটা গরম হচ্ছে দেখা। এক ওমের রেজিস্টান্স যদি এক ভোল্টের সেলের পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্তে লাগানো থাকে, তাহলে এক ওয়াট ইলেকট্রিক যায় তার দিয়ে। কাজেই একটা তারে কতো ওয়াট ইলেকট্রিক যাচ্ছে যদি মাপতে পারিস তাহলে তারটার রেজিস্টান্সও মাপতে পারবি। ওয়াট কতো যাচ্ছে মাপতে হলে তারটা খানিকটা জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। খানিকক্ষণ বাদে জলটার কতোটা উত্তাপ বাড়লো তাই দেখে তারে কতো ওয়াট ইলেকট্রিক গেছে জানা যায়।"

ভোঁদা বললে, "ঠিক বুঝতে পারলাম না। কতো ওয়াট গেলে কতো উত্তাপ বাড়বে বলো দিকিনি?"

খোকন বললে, "যদি আধসের জলে একটা ইলেকট্রিকের তার ডুবিয়ে দিস আর যদি সেই তার দিয়ে এক ওয়াট ইলেকট্রিক যায় তাহলে প্রায় সাড়ে সতেরো মিনিটে জলটার উত্তাপ এক ডিগ্রি বাড়বে। ডিগ্রি কাকে বলে জানিস তো?"

ফটকে বললে, "হ্যাঁ, আমাদের দেহের উত্তাপ তো ৯৮·৪ ডিগ্রি—জ্বর দেখার থার্মোমিটার দিয়ে দেখে, আমাদের গায়ের উত্তাপ কতো ডিগ্রি হলো।"

খোকন বললে, "কাজেই দেখ, রেজিস্টান্স মাপা কতো সোজা। যে-তারটার রেজিস্টান্স মাপছিস সেটা একটা টর্চের সেলের সঙ্গে লাগিয়ে দে, তারপর আধসের জল একটা গেলাসে নিয়ে তারটা জলের ভেতর ডুবিয়ে দে, জলে একটা থার্মোমিটার ডোবা আর ঘড়ি ধরে দেখ কতোক্ষণে জলের উত্তাপ এক ডিগ্রি বাড়ে। যদি সাড়ে সতেরো মিনিট লাগে তাহলে তারে এক ওয়াট যাচ্ছে, যদি পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগে তাহলে আধ ওয়াট যাচ্ছে, যদি পৌনে ন মিনিট লাগে তো দু ওয়াট যাচ্ছে,—কারণ তারে ওয়াট বেশি গেলে তারটা তাড়াতাড়ি গরম হবে আর জলও তাড়াতাড়ি গরম হবে, আর ওয়াট কম গেলে তারটা আস্তে আস্তে গরম হবে কাজেই জলও দেরিতে গরম হবে।

"আগেই বলেছি, এক ভোল্টের সেলে এক ওমের রেজিস্টান্স লাগালে এক ওয়াট ইলেকট্রিক যায়, তেমনি আধ ওম্ লাগালে দু ওয়াট যায় আর দু ওম্ লাগালে আধ ওয়াট যায়।

"তারে ক ওয়াট ইলেকট্রিক যাচ্ছে তা তো জল গরম করে জানা গেলো, কাজেই তারের রেজিস্টান্সও মাপা গেলো,—কারণ তারে এক ওয়াট গেলে রেজিস্টান্স এক ওম্, দু ওয়াট্ গেলে রেজিস্টান্স আধ ওম্, আর আধ ওয়াট্ গেলে রেজিস্টান্স দু ওম্।"

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "রেজিস্টান্স কী করে মাপে তা তো বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু কারেণ্ট কী করে মাপে তা তো বললে না?"

খোকন বললে, "মোটা তার সেলে লাগালে বেশি কারেণ্ট যাবে, সরু তার লাগালে কম কারেণ্ট যাবে—একথা আগেই বলেছি। কিন্তু কারেণ্ট মাপার কথা তখন বলিনি। এইবার বলছি। এক ভোল্টের সেলে এক ওমের তার লাগালে যে কারেণ্ট যায় সেটাকে বলে এক অ্যামপিয়ার (ampere) কারেণ্ট: সেলে আধ ওমের তার লাগালে যে কারেণ্ট যায় তার মাপ হলো দু অ্যামপিয়ার।

"কাজেই সেল কতো ভোল্টের আর তার কতো ওমের—এই দুটো কথা জানা থাকলে কতো অ্যামপিয়ার কারেণ্ট যাচ্ছে, জানা যায়। তেমনি যদি কারেণ্ট জানা থাকে তাহলে তারের ওম্ও পাওয়া যায়।"

ফটকে বললে, "কী করে?"

খোকন বললে, "এ তো সোজা কথা। এক ভোল্টে এক ওম্ লাগালে এক অ্যামপিয়ার যায়, কাজেই এক ভোল্ট সেল যদি একটা তারে এক অ্যামপিয়ার কারেণ্ট দেয়, তাহলে তারটার রেজিস্টান্স এক ওম্, যদি সেলটা দু অ্যামপিয়ার কারেণ্ট দেয় তাহলে রেজিস্টান্স আধ ওম্। মানে ভোল্টকে ওম্ দিয়ে ভাগ

করলে অ্যামপিয়ার পাওয়া যায়, আর ভোল্টকে অ্যামপিয়ার দিয়ে ভাগ করলে ওম্ পাওয়া যায়।"

ভোঁদা বললে, "ওয়াট কী করে পাওয়া যায় খোকনদা ?"

খোকন জিজ্ঞাসা করলে, "তুই জিজ্ঞাসা করছিস অ্যামপিয়ারকে বা ভোল্টকে কী দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে ওয়াট পাওয়া যায়,— তাই তো ?"

ভোঁদা বললে, "হ্যাঁ।"

খোকন বললে, "সেটা বোঝাবার আগে আবার আমার টিনের কৌটোটা নিই। এবারে দেখ, নলটার সামনে আর-একটা নল জুড়ে দিয়েছি,—নল দুটোর মাপ কিন্তু সমান নয়, একটা মোটা আর একটা সরু। এইবারে যদি টিনের কৌটোয় জল ঢালি তাহলে সরু-মোটা দুটো নল দিয়েই তো সমান জল যাবে, নয় ভোঁদা ?"

ভোঁদা বললে, "হ্যাঁ, তা তো যাবেই।"

খোকন বললে, "তেমনি যদি সেলে একটা মোটা আর একটা সরু তার পর-পর জুড়ি, তাহলে দুটো তারের ভিতর দিয়েই সমান কারেণ্ট যাবে। এই দেখ, এই রকম করে তার জুড়েছি। ফটকে, তার দুটোয় এইবার আলাদা আলাদা আঙুল দে-তো ?"

ফটকে বললে, "না বাবা, আবার আমার আঙুল পুড়ুক আর কি !"

খোকন বললে, "দিয়েই দেখ না কী হয়।"

ফটকে ভয়ে ভয়ে তার দুটোয় আঙুল ঠেকিয়ে বললে, "দুটো তারই তো গরম হয়েছে দেখছি ; কিন্তু সরু তারটা বেশি গরম হয়েছে কেন ?" (পরীক্ষাটার ছবি পরের পাতায়।)

খোকন বললে, "তার দুটোয় কারেন্ট সমান গেলেও, ওয়াট সমান যাচ্ছে না। যে তারটা বেশি গরম হচ্ছে সেটায় ওয়াট যাচ্ছে বেশি।"

ভোঁদা বললে, "হ্যাঁ, এ কথা তো আগেই বললে যে তারে ওয়াট বেশি গেলে তার তাড়াতাড়ি গরম হয়।"

খোকন বললে, "যদি দুটো তারে একই কারেন্ট পাঠানো হয় তাহলে যেটার রেজিস্টান্স বেশি সেটায় বেশি ওয়াট যাবে। যদি একটা তারের রেজিস্টান্স অন্যটার থেকে ডবল হয় তাহলে ওয়াট ডবল যাবে, ইত্যাদি।

"তেমনি একটাই যদি তার থাকে, তাহলে কারেন্ট যতোক্ষণ সমান থাকে ততোক্ষণ রেজিস্টান্স বাড়লে ওয়াট বাড়বে।
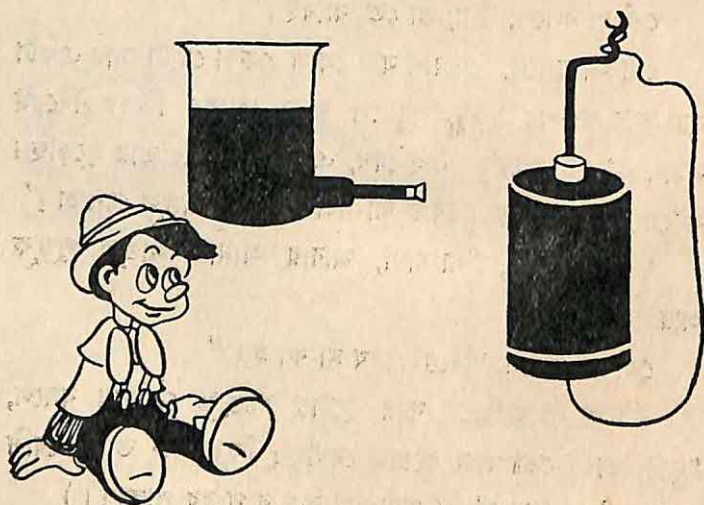
রেজিস্টান্সকে কারেণ্টের বর্গ দিয়ে গুণ করলে ওয়াট পাওয়া যায় অর্থাৎ :

$$\text{ওয়াট} = \text{ওম্} \times (\text{অ্যামপিয়ার})^{২}$$

"অর্থাৎ এক ওম্ তারে যদি দু অ্যামপিয়ার কারেণ্ট যায় তাহলে ওয়াট হবে $১ \times ২^{২} = ৪$। যদি দু ওম্ তারে ছ অ্যামপিয়ার কারেণ্ট যায় তাহলে ওয়াট হবে $২ \times ৬^{২} = ৭২$।

"একটু আগেই বলেছি, ভোল্টকে ওম্ দিয়ে ভাগ করলে অ্যামপিয়ার পাওয়া যায়। এবারে একটু ছোট্ট অঙ্ক কসবো, ঘাবড়ে যাস নি যেন।

$$\text{আচ্ছা, ওয়াট} = \text{ওম্} \times (\text{অ্যামপিয়ার})^{২}$$

নিয়মটাকে এইভাবেও তো লেখা যায় :

$$\text{ওয়াট} = \text{ওম্} \times \text{অ্যামপিয়ার} \times \text{অ্যামপিয়ার}$$
$$= \text{ওম্} \times \text{অ্যামপিয়ার} \times \frac{\text{ভোল্ট}}{\text{ওম্}}\text{''}$$

ফটকে বললে, "অ্যামপিয়ার বদলে $\frac{\text{ভোল্ট}}{\text{ওম্}}$ লিখলে কেন ?"

ভোঁদা বললে, "তুই যেন কী ? এক্ষুনি খোকনদা বললে না, ভোল্টকে ওম্ দিয়ে ভাগ করলে অ্যামপিয়ার পাওয়া যায়।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ। এইবার ওম্‌কে ওম্ দিয়ে কাটাকুটি করলে কী পারি দেখ,

$$\text{ওয়াট} = \text{অ্যামপিয়ার} \times \text{ভোল্ট}।$$

আগেকার নিয়ম দুটো আবার লিখি দেখ :

$$\text{অ্যামপিয়ার} = \frac{\text{ভোল্ট}}{\text{ওম্}}$$

$$\text{ওম্} = \frac{\text{ভোল্ট}}{\text{অ্যামপিয়ার}}$$

"এই তিনটি নিয়ম মনে থাকলেই একেবার পাকা মিস্ত্রি হতে পারবি।

"ফটকে, ঐ তাকের উপর একটা বাল্‌ব্‌ আছে, নিয়ে আয় তো। ওর গায়ে কী লেখা আছে দেখ তো।"

ফটকে বললে, "২২০ ভোল্ট ৪০ ওয়াট।"

খোকন বললে, "এর মানেটা কী?"

ভোঁদা বললে, "কেন, তুমি তো সেদিন বলে দিয়েছো, এর মানে বাল্‌বটা ৪০ ওয়াট ইলেকট্রিক খায়।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু ২২০ ভোল্ট কথাটার মানে তো সেদিন বলিনি। সেটা আজ বলি। ২২০ ভোল্ট ৪০ ওয়াট মানে বাল্‌ব্‌টা ৪০ ওয়াট খাবে যদি ২২০ ভোল্টে বাল্‌ব্‌টা লাগানো হয়—অন্য ভোল্টে লাগালে নয় কিন্তু। তেমন ৪৩ পাতায় তারের ওয়াটের যে হিসেব দিয়েছি সেটা ২২০ ভোল্টের হিসেব। ২২০ ভোল্ট ৪০ ওয়াট হলে কতো কারেন্ট যায় বাল্‌ব্‌টায় বল তো ভোঁদা?"

ভোঁদা বললে, "কেন? এ তো সোজা কথা। তুমি তো বলে দিয়েছো ওয়াট = ভোল্ট × অ্যামপিয়ার; তাহলে ৪০ = ২২০ × অ্যামপিয়ার, অর্থাৎ অ্যামপিয়ার হচ্ছে $\frac{৪০}{২২০}$ মানে $\frac{২}{১১}$ অ্যামপিয়ার"।

খোকন বললে, "বহুৎ আচ্ছা। এইবার বাল্ব্‌টার রেজিস্টান্স কতো বল দিকি?"

ফটকে বললে, "এটা তো সোজা। অ্যামপিয়ার = $\frac{\text{ভোল্ট}}{\text{ওম্}}$।

কাজেই, $\frac{২}{১১} \times \frac{২২০}{\text{ওম্}}$ অর্থাৎ ওম্ = $২২০ \times \frac{১১}{২}$ মানে ১২১০ ওম্।"

খোকন ফটকের পিঠ চাপড়ে বললে, "ব্যস, একেবারে পাক্কা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনয়ার হয়ে গেছিস্ দেখছি।

"আচ্ছা ধর, এই বাল্ব্‌টা আমাদের বাড়ির ছাদে লাগানো হলো, কাজেই মেন স্যুইচ থেকে বাল্ব্ অবধি তার টানতে হবে। মনে কর, ৭/·০২৯ তার টানা হয়েছে আর ঠাণ্ডা-গরম তার মিলিয়ে ১৯০ গজ হয়েছে। এই যে $\frac{২}{১১}$ অ্যামপিয়ার কারেন্ট, এটা ঐ ১৯০ গজ ৭/·০২৯ তারেও যাবে। এই তারটার রেজিস্টান্স এক ওম্। তাহলে তারটা কতো ওয়াট খাচ্ছে?"

ভোঁদা বললে, "ওয়াট = ওম্ × (অ্যামপিয়ার)^{২}—তাহলে তারে যা ওয়াট খাচ্ছে সেটা হলো $১ \times (\frac{২}{১১})^{২}$ অর্থাৎ $\frac{৪}{১২১}$ ওয়াট।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, তবে $\frac{৪}{১২১}$ ওয়াট না বলে আমি দশমিকে নিয়ে গিয়ে বলবো প্রায় ৪০·০৩৩ ওয়াট।

"কাজেই দেখছো, আসলে ৪০·০৩৩ ওয়াট খরচা হচ্ছে, এর মধ্যে ৪০ ওয়াট খাচ্ছে আলোর বাল্ব্‌টা, আর ·০৩৩ ওয়াট খাচ্ছে তারটা।

"বাল্বে যে কারেন্ট আসছে সেটা কোম্পানির ব্যাটারি থেকে আমাদের বাড়ি অবধি যে তার এসেছে সেই তারেও আছে।

কাজেই সেই তারও কিছু ওয়াট খাচ্ছে। এই তারের রেজিস্টান্স যদি এক ওম্ হয় তো এটা ·০৩৩ ওয়াট খাচ্ছে, যদি দশ ওম্ হয় তো ·৩৩ ওয়াট খাচ্ছে, একশো ওম্ হলে ৩·৩ ওয়াট, হাজার ওম্ হলে ৩৩ ওয়াট ইত্যাদি।

"ধর, কোম্পানির ব্যাটারি থেকে আমাদের বাড়ি যে-তার এসেছে সেটার রেজিস্টান্স হাজার ওম্। তাহলে আমাদের বাড়িতে ৪০ ওয়াট বাল্‌ব জ্বাললে সবশুদ্ধ ৭৩·০৩৩ ওয়াট ইলেকট্রিক খরচা হবে। ৪০ ওয়াট খাচ্ছে বাল্‌ব্, ৩৩ ওয়াট খাচ্ছে কোম্পানির তার আর ·০৩৩ ওয়াট খাচ্ছে আমাদের বাড়ির তার।

"আমরা বাড়িতে যতো ওয়াট খরচা করি ঠিক ততো ওয়াটের জন্যেই কোম্পানি আমাদের কাছ থেকে পয়সা নেয়। কাজেই আমাদের ৪০·০৩৩ ওয়াট ইলেকট্রিক দেবার জন্যে যদিও কোম্পানির আসল খরচা হয় ৭৩·০৩৩ ওয়াট, কোম্পানি দাম পায় মাত্র ৪০·০৩৩ ওয়াটের। ৩৩ ওয়াট কোম্পানির লোকসান হয়।"

ফটকে বললে, "বলো কি? কোম্পানি যে লাটে উঠবে এতো লোকসান দিলে!"

ভোঁদার অঙ্কয় মাথাটা একটু খোলে। সে বিড়-বিড় করে হিসেব করে বললে, "হ্যাঁ তা তো যাবেই। শতকরা প্রায় চাল্লিশ ভাগ ইলেকট্রিকের দাম কোম্পানি পায় না।"

খোকন বললে, "কাজেই প্রত্যেক কোম্পানির প্রাণপণ চেষ্টা, যাতে ব্যাটারি থেকে লোকের বাড়ি অবধি আসা তারে সবচেয়ে কম ওয়াট খরচা হয়। সে-জন্যে নানা রকম ব্যবস্থাও করা

হয়। সে-কথা পরে বলবো। তার আগে পাখা কী করে ঘোরে তার গল্প বলাই ভালো। কিন্তু এর জন্যে দু-একটা পরীক্ষা করতে হবে ; দরকারি জিনিসপত্র আজ কিনে রাখবো, তোরা কাল আসিস আবার গল্প শুনতে।”
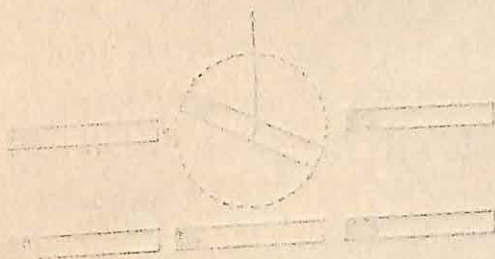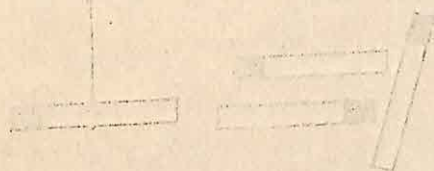
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
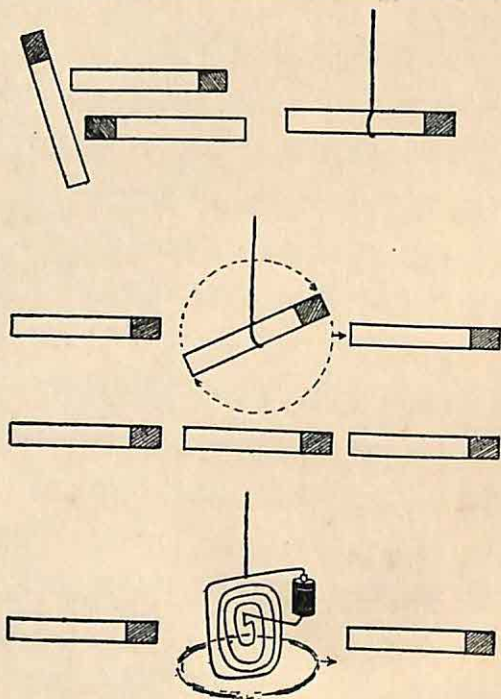
চুম্বকের রূপগুণ : উত্তরমুখী মাথা কালো দেখানো হয়েছে

পরের দিন খোকন আবার গল্প শুরু করলো, "এই দেখ, এইগুলোকে বলে চুম্বক বা magnet। চুম্বকদের মজা এই যে ওরা লোহা টানে এবং একটা চুম্বক আবার অন্য চুম্বক টানে।"

ভোঁদা বললে, "এ আর কে না জানে?"

খোকন বলতে লাগলো, "চুম্বকদের আবার অন্য আর-একটা মজা আছে। একটা চুম্বক যদি সুতো দিয়ে ঝোলাই তাহলে দেখবি যে সেটা ঘুরে গিয়ে উত্তর দক্ষিণ বরাবর রয়ে গেলো; একটু ঘুরিয়ে ছেড়ে দে, দেখবি আবার ঘুরে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর দাঁড়ালো। শুধু তাই নয়, চুম্বকের একটা মাথা বরাবরই উত্তর-মুখো আর অন্য মাথাটা বরাবরই দক্ষিণ-মুখো থাকে। সেই জন্যে এই মাথা দুটোকে বলা হয় উত্তরমুখী ও দক্ষিণমুখী মাথা। একটা চুম্বকের উত্তরমুখী মাথা আর-একটা চুম্বকের উত্তরমুখী মাথার কাছে নিয়ে আয়,—দেখবি, চুম্বক দুটো পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু একটা চুম্বকের উত্তরমুখী মাথাটা আর একটা চুম্বকের দক্ষিণমুখী মাথার কাছে নিয়ে আয়, দেখবি চুম্বক দুটো পরস্পরকে টানছে।

"এইবার দেখ, দুটো চুম্বকের মাঝখানে আর-একটা চুম্বক ঝুলোলাম (৮৪ পাতার ছবি)। দেখ, ঝুলোনো চুম্বকের দক্ষিণ-মুখী মাথাটা বাঁদিকের চুম্বকের উত্তরমুখী মাথাটা টানতে শুরু করলো, আর ঝুলোনো চুম্বকের উত্তরমুখী মাথাটা ডানদিকের চুম্বকের দক্ষিণমুখী মাথাটা টানতে শুরু করে দিলো। কাজেই হলো কি, ঝুলোনো চুম্বকটা ঘুরে গিয়ে অন্য চুম্বক দুটোর লাইন-বরাবর হয়ে থেমে গেলো।

"এইবারে মাঝের ঝুলোনো চুম্বকটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা তামার তার কুণ্ডলী পাকিয়ে সুতো দিয়ে ঝুলোলাম (৮৪ পাতার নিচের ছবি)। চুম্বক তো আর তামাকে টানে না, কাজেই তারের কুণ্ডলীটা যেভাবে রাখলাম সেইভাবেই রইলো।

এইবার একটা টর্চের সেল লাগিয়ে তারের কুণ্ডলীটার ভেতর দিয়ে কারেন্ট পাঠাতেই কুণ্ডলীটা সাঁৎ করে ঘুরে গেলো, ঠিক আগের বারে ঝুলোনো চুম্বকটা যেমন ঘুরে গিয়েছিলো।

"কাজেই দেখছিস, কুণ্ডলীতে কারেন্ট গেলে সেটা চুম্বকের মতো ব্যবহার করে। কারেন্ট তারে গেলে শুধু যে তারটাকে গরমই করে তা নয়, সেটাকে চুম্বকও করে। কারেন্ট বন্ধ হলেই তার বা তারের কুণ্ডলী আর চুম্বক থাকে না।

"এইবার একটা কুণ্ডলীর জায়গায় দুটো কুণ্ডলী নিলাম আর সেদুটোকে সুতো দিয়ে বাঁধলাম (এই পাতার তলার ছবি)। এইবার একটা কুণ্ডলীতে কারেন্ট পাঠালাম টর্চের সেল দিয়ে। কুণ্ডলীটা সাঁৎ করে ঘুরে গেলো খানিকটা। এইবার প্রথম কুণ্ডলী থেকে টর্চের সেলটা খুলে দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে লাগালাম, যেই দ্বিতীয় কুণ্ডলীটাতে কারেন্ট গেলো অমনি এটাও চুম্বক হয়ে গেলো আর এ কুণ্ডলীটাও সাঁৎ করে একটু ঘুরে গেলো।"

ভোদা বললে, "ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

খোকন বললে, "একটা কুণ্ডলীতে টর্চের সেল লাগিয়ে কারেন্ট পাঠালাম। কারেন্টটা কোনমুখো যাচ্ছে বল্ তো।"
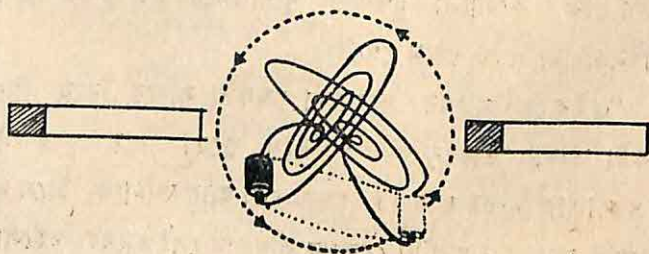
ফটকে বললে, "কেন ? ইলেকট্রিক তো টর্চের পজিটিভ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে নেগেটিভ প্রান্তে যায়, এতো তুমি সেদিন বলেছো।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ। এইবারে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ছাড়া অন্য চারটে আঙুল দিয়ে কুণ্ডলীটা মুঠো করে ধর তো, আর বুড়ো আঙুলটা ছড়িয়ে ধর এই রকম করে (পাতার তলার ছবি)। মুঠো করবি এমনভাবে যেন কারেণ্টের গতির দিকে তোর বুড়ো আঙুলের মাথা থাকে। তাহলে কারেণ্ট পাঠানোর ফলে কুণ্ডলীটা চুম্বক হবে যখন, তখন সেই চুম্বকের উত্তরমুখী মাথাটা হবে তোর বুড়ো আঙুলের মাথা যেদিকে আছে সেই দিকে।

"প্রথম কুণ্ডলীটার ভেতর দিয়ে কারেণ্ট পাঠালে সেটা তো চুম্বক হবে; কুণ্ডলীটার বদলে মনে কর একটা চুম্বক আছে (৮৬ পাতার ছবি)। যেমন আগের বারে (৮৪ পাতার ছবি) ঝোলানো চুম্বকটা ঘুরে গিয়ে দু পাশের চুম্বকের
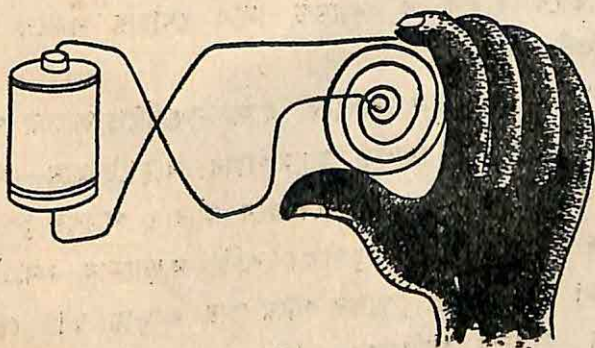
লাইন-বরাবর হয়েছিল, তেমনি এখানেও ঝোলানো চুম্বক অর্থাৎ প্রথম কুণ্ডলীটা ঘুরে গেলো আর তু পাশের চুম্বকের লাইন-বরাবর হলো মাঝের চুম্বকটা। দ্বিতীয় কুণ্ডলীটাতে এতোক্ষণ কোনো কারেন্ট ছিলো না, কাজেই সেটাকে কেউ টানাটানি করেনি। কিন্তু এই দ্বিতীয় কুণ্ডলীটা প্রথমটার সঙ্গে বাঁধা, কাজেই প্রথম কুণ্ডলীটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিতীয়টাও কান টেনে মাথা আসার মতো বাধ্য হয়ে খানিকটা ঘুরে গিয়েছিলো। এইবার প্রথম কুণ্ডলীটায় কারেন্ট বন্ধ করে দ্বিতীয়টায় কারেন্ট পাঠালে দ্বিতীয় কুণ্ডলীটা চুম্বক হলো, আর এই চুম্বকটাও তুপাশের চুম্বকের লাইন-বরাবর হওয়ার চেষ্টা করার জন্যে দ্বিতীয় কুণ্ডলীটাকে খানিকটা ঘুরতে হলো—আর টিকি বাঁধা বলে প্রথম কুণ্ডলীটাও ঘোরা থেকে রেহাই পেলো না। কাজেই ব্যাপারটা হলো কি, একবার প্রথম কুণ্ডলীটায় আর একবার দ্বিতীয় কুণ্ডলীটায় তারপর আবার প্রথমটায়—এই রকম করে কারেন্ট পাঠালে তারের কুণ্ডলী জোড়া বাঁই-বাঁই করে ঘুরবে। এই রকমভাবে ইলেকট্রিক কারেন্ট নিয়ে ঘোরার কলকে বলে ইলেকট্রিক মোটর।

"মোটরের তেজ বাড়াতে হলে কুণ্ডলীতে তারের পাক বাড়াতে হবে, কারেণ্টের অ্যামপিয়ার বাড়াতে হবে—অর্থাৎ ব্যাটারির সেলের সংখ্যা বাড়াতে হবে আর তু পাশের চুম্বকের শক্তি বাড়াতে হবে। চুম্বকের শক্তি বাড়ানোর সবচাইতে সোজা ব্যবস্থা হচ্ছে, চুম্বকের গায়ে তার জড়িয়ে তার ভেতর নিয়ে কারেন্ট পাঠানো। তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে

কারেণ্ট গেলে চুম্বক হয় সে-কথা তো এক্ষুনি বললাম, কাজেই যদি তারের কুণ্ডলীটা চুম্বকেই পরানো থাকে তাহলে চুম্বকের শক্তির সঙ্গে তারের কুণ্ডলীর শক্তি যোগ হবে। অবশ্য তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে কারেণ্ট এমনভাবে যাওয়া চাই যে তারের কুণ্ডলীর চুম্বকের উত্তরমুখটা যেন লোহার চুম্বকটার (মানে যার উপর তারের কুণ্ডলীটা জড়ানো আছে) উত্তর মুখের দিকেই হয় ; তা না হলে চুম্বকের শক্তি না বেড়ে কমবে।

"দুপাশে দুটো চুম্বক না রেখে যদি একটা চুম্বককেই গোল করে তার দুটো মাথা মাঝের তারের কুণ্ডলীদের দুপাশে রাখা যায়— তাহলেও ফল একই হয়।

"আসল মোটরে এই রকম একটা গোল চুম্বকই ব্যবহার করা হয় কিন্তু তার চেহারাটা একটু অন্য রকমের আর তার ওপর তার জড়ানো থাকে কারেণ্ট যাবার জন্যে। মাঝের তারের কুণ্ডলী জোড়া আসল মোটরে লোহার ওপর জড়ানো থাকে।
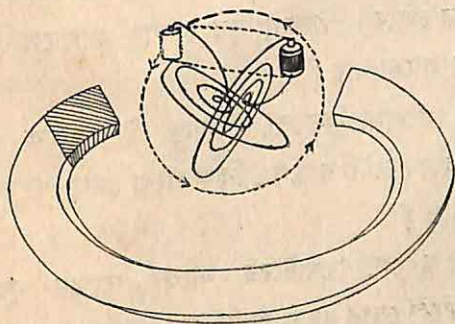
মোটরের জোর আরও বাড়াতে হলে মাঝের তারের কুণ্ডলীর সংখ্যা দুই থেকে বাড়িয়ে চার, ছয়, আট, দশ কি আরও বেশি করলেই হবে; আর চুম্বকের সংখ্যাও বাড়াতে পারলে জোর আরও বেশি হবে।
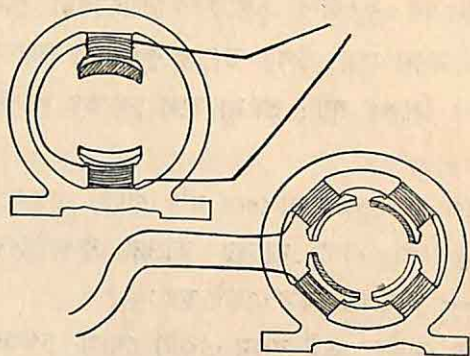
"এই ইলেকট্রিক মোটর অনেক রকম কাজে লাগে। মোটরে তিনটে ব্লেড দিলেই ইলেকট্রিক পাখা হয়ে গেলো। কারখানার কলকব্জায় লাগিয়ে দিলে ইলেকট্রিক কারখানা চলে। ট্রামগাড়ির চাকায় লাগিয়ে দিলে মোটরটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ট্রামগাড়িও গড়গড় করে চলবে। রেলগাড়ির চাকায় লাগালে ইলেকট্রিক রেলগাড়ি চালানো যায়।"

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা ইলেকট্রিক পাখা তো আসলে একটা মোটর বললে; কিন্তু পাখা জোরে আস্তে ঘোরানো যায় কী করে?"

খোকন বললে, "মোটরের মাঝের তারের কুণ্ডলীগুলোর কারেন্ট বাড়ালে জোর বাড়ে, অর্থাৎ জোরে ঘোরে—একথা আগেই

বললাম। কাজেই পাখা জোরে বা আস্তে ঘোরাতে হলে কারেণ্ট জোর বা আস্তে করতে হবে অর্থাৎ রেজিস্টান্স কমবেশি করতে হবে। পাখা জোর বা আস্তে ঘোরানোর জন্যে সুইচের কাছে যে-বাক্সটা থাকে আসলে সেটা একটা রেজিস্টান্স, আর এই রেজিস্টান্সটা খুশিমতো বাড়ানো কমানো যায়। ধর পাখার আর্মেচার—।”

ফটকে বললে, “আর্মেচার কাকে বলে বলোনি তো!”

খোকন বললে, “বড্ড ভুল হয়ে গেছে। মোটরের চুম্বকের উপর যে তারের কুণ্ডলী জড়ানো থাকে তাকে বলে field coil
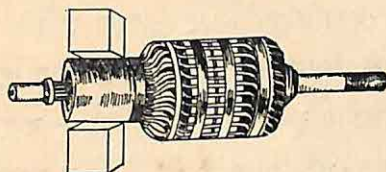
বা ক্ষেত্রকুণ্ডলী আর এইরকম তার-জড়ানো চুম্বককে বলে electromagnet বা বৈদ্যুতিক চুম্বক। চুম্বকের মাঝে যে কুণ্ডলীগুলো ঘোরে তাকে বলে armature coil আর এই কুণ্ডলীজড়ানো গোটা লোহার জিনিসটাকে বলে armature।

“ধর, পাখার আর্মেচারের কুণ্ডলীগুলোর রেজিস্টান্স ৪৪০ ওম্। তাহলে ২২০ ভোল্টে পাখা লাগালে আর্মেচারে আধ অ্যামপিয়ার কারেণ্ট যাবে তো।”

ভোঁদা বললে, “হ্যাঁ, তা তো যাবেই, ভোল্টকে ওম্ দিয়ে ভাগ করলেই তো অ্যামপিয়ার পাওয়া যায়।”

খোকন বললে, "এইবারে ধর, পাখা জোর-কম করার বাক্সটাতে ৪৪০ ওম্ দিলি। এই বাক্সটাকে বলে রেগুলেটার। এই রেগুলেটারটা তার দিয়ে আর্মেচারের সঙ্গে লাগানো আছে; কাজেই এখন রেজিস্টান্স হলো আর্মেচারের ৪৪০ ওম্ আর রেগুলেটারের ৪৪০ ওম্। এই ৮৮০ ওম্ ২২০ ভোল্টে লাগালে কারেন্ট যাবে মাত্র সিকি অ্যামপিয়ার। আগে যাচ্ছিলো আধ অ্যামপিয়ার, এখন হলো সিকি অ্যামপিয়ার। কাজেই আর্মেচার আস্তে ঘুরবে আগের চেয়ে।"

ফটকে বললে, "আচ্ছা তুমি যখন আমাদের তারের কুণ্ডলী-নিয়ে পরীক্ষা দেখাচ্ছিলে (৮৫ পাতার ছবি) তখন মোটর ঘোরানোর জন্যে টর্চের সেলের তার একবার প্রথম কুণ্ডলীতে, আর একবার দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে লাগাচ্ছিলে—কারেন্ট ঐ কুণ্ডলী-দের মধ্যে দিয়ে পাঠানোর জন্যে। কিন্তু আমাদের ঘরে যে পাখা ঘোরে তখন কে এ-কুণ্ডলী ও-কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাঠায়?"

খোকন বললে, "তোদের বোঝানোর জন্যে একটা মোটর তৈরী করে রেখেছিলাম। দেখাই আগে। ইচ্ছে করলে এরকম মোটর তোরাও তৈরী করতে পারিস।

"গোটা কয়েক চ্যাপটা চাবির রিঙ জোগাড় করে ওপর-ওপর সাজিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধলাম, তারপর সবশুদ্ধ একটা মোটা কাঠের লাঠির উপর পরালাম, লাঠিটা নিয়েছি রিঙগুলোর মাপে-মাপে, যাতে রিঙগুলো বেশ টাইট হয়। এইবার রিংগুলোর ওপর দিয়ে দুটো কুণ্ডলী জড়ালাম। চারটে লোহার পাত নিয়ে

কাঠের লাঠিটার ওপর পেরেক দিয়ে ঠুকে বসালাম। কুণ্ডলী দুটোর তারের আগা আর গোড়া এই লোহার পাত চারটের
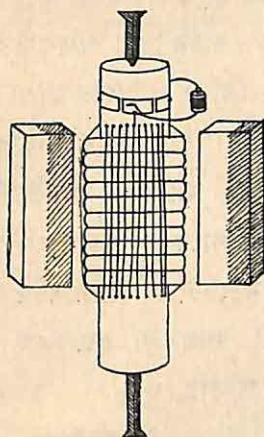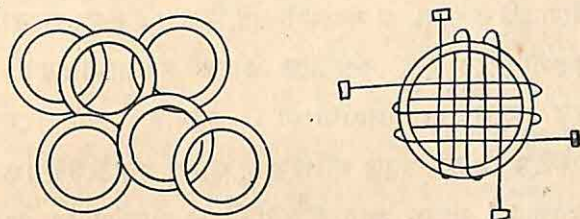
সঙ্গে ঝাল দিয়ে লাগালাম। এইবার টর্চের সেল থেকে দুটো তার নিয়ে এসে একজোড়া লোহার পাতে ঠেকালাম। দেখ, এই পাতজোড়ায় যে কুণ্ডলীটা লাগানো আছে, কারেন্ট তার ভেতর দিয়ে যাবে। ভোঁদা, এইবার এই লোহার লাঠিটাকে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে ঘোরা তো। দেখ, যতোক্ষণ না লাঠিটা আধপাক ঘুরছে ততোক্ষণ পর্যন্ত এই কুণ্ডলীটা দিয়েই কারেন্ট

চলে যাবে। কিন্তু আধ পাক ঘোরা হয়ে গেলেই আপনা থেকে অন্য কুণ্ডলীতে কারেন্ট চলে যাবে।

"ইলেকট্রিক পাখা, বা সব মোটরেই, ঠিক এই রকম ব্যবস্থাতেই এক কুণ্ডলী থেকে অন্য কুণ্ডলীতে কারেন্ট বদলানো হয়। এই ব্যবস্থাকে বলে commutator। আমার তৈরী মোটরে কমিউটেটরে লোহার পাত লাগিয়েছি, আসল কমিউটেটরে তামার পাত লাগানো থাকে আর কমিউটেটরটা আর্মেচারের লোহার ডাণ্ডার উপরই বসানো থাকে। অবশ্য অভ্র কি ঐ রকমের অন্য একটা কিছু,—যার ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক যেতে পারে না,— সেই রকম একটা জিনিস লোহার ডাণ্ডা আর কমিউটেটারের মাঝে থাকে। তা না হলে কমিউটেটার বেয়ে কারেন্ট যে লোহার ডাণ্ডায় চলে যাবে। কমিউটেটারের পাতগুলোর মাঝেও অভ্র দেওয়া থাকে। কোম্পানির ব্যাটারির কারেন্ট যে তার বেয়ে কমিউটেটারে যায় সেটার শেষে দুটো ছোটো ছোটো কার্বনের লাঠি লাগানো হয়, এই লাঠিদের বলে ব্রাস (brush)। (৯০ পাতার ছবি)। কার্বন কি জানিস তো? এই টর্চের সেলের মাঝখানে কার্বনের একটা লাঠি আছে (১৫ পাতার ছবি)।

"আমাদের বাড়ির যে ইলেকট্রিকের মিটার আছে সেটাও একটা ইলেকট্রিক মোটর। বাড়িতে যতো কারেন্ট আসে সব এই মিটারের মোটরের ভেতর দিয়ে আসে। কাজেই কারেন্ট বেশি এলে মিটার তাড়াতাড়ি ঘুরবে, কম এলে আস্তে আস্তে ঘুরবে। মিটারের মোটরের আর্মেচারের ডাণ্ডাটার সঙ্গে একসার কাঁটা-

ওয়ালা চাকা আছে, আর এই চাকাগুলোর সঙ্গে আবার একটা কল লাগানো আছে ; এই কলটাতে চাকাগুলো বা আর্মেচার কতো পাক ঘুরলো তা উঠে যায়।

"কতো ওয়াট আমরা খরচা করেছি মাসে তার হিসেব করে কোম্পানি আমাদের কাছ থেকে দাম নেয়। ইলেকট্রিকের দাম হিসেব হয় ইউনিটের (unit) ওপর। যদি হাজার ওয়াট এক ঘণ্টা ধরে খরচা করো তো এক ইউনিট ইলেকট্রিক খরচা হবে। পাঁচশো ওয়াট দু ঘণ্টা ধরে খরচা করলেও এক ইউনিট ইলেকট্রিক পুড়বে অর্থাৎ $\text{ইউনিট} = \frac{\text{ওয়াট} \times \text{ঘণ্টা}}{১০০০}$।
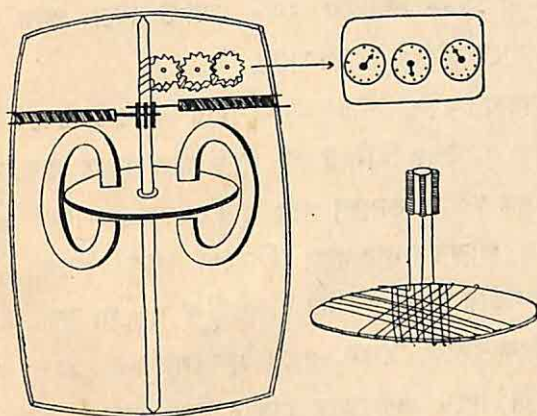
"কলকাতায় এক ইউনিটের দাম তিন আনা। মাসের শেষে কোম্পানির লোক এসে মিটার দেখে। যতো ইউনিট খরচা হয়েছে, তাকে তিন দিয়ে গুণ করে যোলো দিয়ে ভাগ করে ততো টাকা বিল করবে।"

ফটকে জিজ্ঞাসা করলে, “মিটারের মোটরের আর্মেচারে তো কারেণ্ট যায়, ইউনিট কতো খরচা হলো কী করে পাবে?”

খোকন বললে, “ধর, মিটারের মোটরের আর্মেচারটা এক অ্যামপিয়ার কারেণ্ট গেলে মিনিটে এক পাক করে ঘোরে, দু অ্যামপিয়ার গেলে মিনিটে দু পাক বেগে ঘোরে, আর আধ অ্যামপিয়ার গেলে মিনিটে আধ পাক করে ঘোরে। ধর, তুই ১১০০ ওয়াট খরচা করছিস; তার মানে পাঁচ অ্যামপিয়ার কারেণ্ট যাচ্ছে মিটারের মোটরে। কারেণ্ট কতো অ্যামপিয়ার যাচ্ছে কী করে পেলাম বল তো?”

ভোঁদা বললে, “কেন, কোম্পানির ব্যাটারির ভোল্ট তো ২২০; ঐ ১১০০ ওয়াটকে ২২০ ভোল্ট দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে কারেণ্ট কতো যাচ্ছে।”

খোকন বললে, “পাঁচ অ্যামপিয়ার কারেণ্ট গেলে মিটারের মোটরের আর্মেচার মিনিটে পাঁচ পাক করে ঘুরতে শুরু করলো। অর্থাৎ এক ঘণ্টায় তিনশো পাক ঘুরে গেলো; কাজেই একঘণ্টায় মিটারের পাক-গোনার-কলে তিনশো পাক উঠলো! কিন্তু এই একঘণ্টায় কতো ইউনিট ইলেকট্রিক পুড়লো বল তো?”

ফটকে বললে, “কেন, এ তো খুব সোজা। ১১০০ ওয়াটকে এক ঘণ্টা দিয়ে গুণ করে হাজার দিয়ে ভাগ করলাম, পেলাম ১·১ ইউনিট।”

খোকন বললে, “হ্যাঁ। কাজেই দেখ, যখন পাক-গোনা-কলে তিনশো উঠলো তখন ইউনিট খরচা ১·১। এইবারে ফটকের ত্রৈরাশিক কাজে আসবে। মাসের শেষে কোম্পানির

লোক মিটারের পাক-গোনা-কল থেকে দেখলো, কতো পাক মিটারের আর্মেচার ঘুরছে, তাকে তিনশো দিয়ে ভাগ করে ১·১ দিয়ে গুণ করলেই পেয়ে যাবে কত ইউনিট ইলেকট্রিক পুড়লো।”

“আচ্ছা এই বারে কস দিকি : একটা ষাট ওয়াটের আলো রোজ দশ ঘণ্টা করে জ্বালালে মাসের শেষে কতো বিল হবে?”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
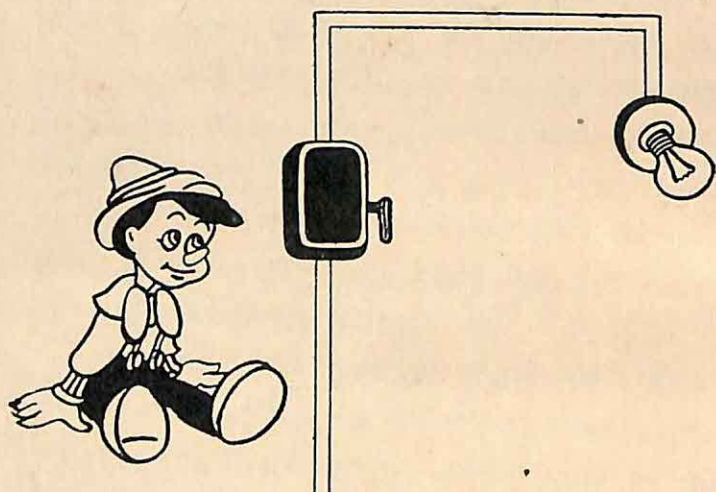
ভোঁদা পরের দিন জিজ্ঞাসা করলো, "কোম্পানি কী করে ইলেকট্রিক তৈরী করে সে সম্বন্ধে কিছু বলো না?"

খোকন বললে, "ইলেকট্রিক মোটরের আর্মেচারের ভেতর দিয়ে কারেন্ট পাঠালে আর্মেচারটা ঘোরে একথা তো কাল বললাম। তেমনি এর উল্টোটাও হয়; অর্থাৎ আর্মেচারটা দু পাশের চুম্বকের মাঝে রেখে জোরে জোরে ঘুরোলে ইলেকট্রিক তৈরী হয়। আমার তৈরী মোটরটা নিয়ে (৯৩ পাতার ছবি) টর্চের সেলটা খুলে তার বদলে একটা টর্চের বাল্‌ব্ লাগালাম;

এইবার আর্মেচারটা খুব জোরে জোরে ঘুরোলেই দেখবি বাল্‌ব্‌টা মিটমিট করে জ্বলছে, বাল্‌ব্‌টা জোর জ্বালাতে হলে আর্মেচারটা এতো জোরে ঘোরাতে হবে যে আর হাতের জোরে কুলোয় না।

"কোম্পানির বাড়ি ঠিক এই রকম করেই ইলেকট্রিক তৈরী হয়। বিরাট বিরাট আর্মেচার বিরাট বিরাট বৈদ্যুতিক চুম্বকের মাঝখানে বাঁই-বাঁই করে ঘোরানো হয়। আর তা হলেই ইলেকট্রিক তৈরী হয়ে গেলো। সেই ইলেকট্রিক প্রথমে ব্যাটারিতে পোরা হয়, পরে ব্যাটারি থেকে তার বেয়ে আমাদের বাড়ি ইলেকট্রিক আসে।"

ফটকে বললে, "তোমার তৈরী ইলেকট্রিক-তৈরীর-কলের বেলায় (৯৩ পাতার ছবি) তো ব্যাটারি লাগাওনি, একেবারেই
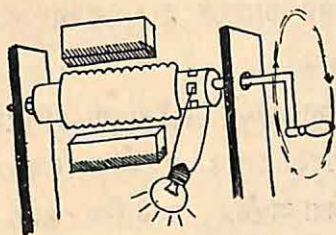
তো টর্চের বাল্‌বে ইলেকট্রিক পাঠিয়েছিলে। কোম্পানি ব্যাটারি লাগায় কেন পয়সা খরচ করে?"

খোকন বললে, "ব্যাটারি যদি না লাগাতো তাহলে সারাক্ষণ ডাইনামো (Dynamo) চালাতে হতো যে! ইলেকটিক তৈরী করার কলকে বলে ডাইনামো বা জেনারেটর (generator)। ব্যাটারি না থাকলে ডাইনামোর আর্মেচার ঘোরানো বন্ধ করলেই সারা শহর অন্ধকার। কিন্তু যদি ব্যাটারি

ব্যবহার করা হয় তা হলে ডাইনামো বন্ধ করলেও ব্যাটারি থেকে জমানো ইলেকট্রিক যাবে শহরে। ধর, ডাইনামোগুলো এমন শক্তিশালী যে সারা শহরে চব্বিশ ঘণ্টায় যতো ইলেকট্রিক পোড়ে তার সবটাই ডাইনামোরা তৈরী করতে পারে বারো ঘণ্টায়। তাহলে, ব্যাটারি লাগালে সুবিধা এই যে, ডাইনামোগুলো মাত্র বারো ঘণ্টা চলে সারাদিনের ইলেকটিক তৈরী করে ব্যাটারিতে পুরে দিলে, আর ব্যাটারিই চব্বিশ ঘণ্টার কাজ চালালো। এতে কতো সুবিধা। ডাইনামো চালানোর লোকের দরকার নেই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ; তাছাড়া ডাইনামো তো আর হাত দিয়ে ঘোরানো যায় না,—ঘোরানোর জন্যে ইঞ্জিন লাগে আর সে-ইঞ্জিন চলে কয়লা বা পেট্রলে ; কাজেই মাত্র বারো ঘণ্টার জন্যেই ইঞ্জিন চালাতে হবে, কয়লা বা পেট্রল কতো বাঁচবে বলো দিকিনি।

"অবশ্য যদি সারাদিনই ডাইনামো চালাতে হয় তাহলে ব্যাটারি না রাখলেও চলতে পারে। কিন্তু সেখানেও ব্যাটারি রাখার একটা সুবিধা আছে। ব্যাটারির ভোল্ট খুব স্থির থাকে, ২২০ ভোল্টের ব্যাটারি ঠিক দুশো কুড়ি ভোল্টই দেবে। কিন্তু ডাইনামোর ভোল্ট অতো স্থির থাকে না ; তার কারণ ডাইনামোর ঘোরার গতির উপর নির্ভর করে ডাইনামোর ভোল্ট, ডাইনামো জোরে ঘুরলে ভোল্ট বেশি হয়, আস্তে ঘুরলে ভোল্ট কম হয়। ডাইনামো ঘোরানোর ইঞ্জিনগুলোর গতি একটু বাড়া-কমার জন্যে ডাইনামোর ভোল্ট বাড়ে-কমে। এইরকম ভোল্ট বাড়া-কমার জন্যে আমাদের বাড়ির আলোর জোরও বাড়বে-কমবে।

কিন্তু যদি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় তাহলে আর আলোর জোর বাড়বে-কমবে না, কারণ শহরে ইলেকট্রিক আসবে ব্যাটারি থেকে আর ডাইনামোর কাজ হবে ব্যাটারিতে ইলেকট্রিক পুরে দেওয়া।"

ফটকে বললে, "ডাইনামো চালানোর ইঞ্জিন সম্বন্ধে কিছু বলবে না ?"

খোকন বললে, "ডাইনামো চালানোর ইঞ্জিন সাধারণত স্টীম ইঞ্জিনই হয়। স্টীম ইঞ্জিন (steam engine) কাকে বলে জানিস্ তো ? রেলগাড়ির ইঞ্জিন হচ্ছে স্টীম ইঞ্জিন ; স্টীম ইঞ্জিন বলে এই জন্যে যে, এই ইঞ্জিনে কয়লা পুড়িয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্প (steam) করে সেই বাষ্পের জোরে ইঞ্জিন চালানো হয়।

"স্টীম ইঞ্জিন ছাড়া, মোটর গাড়ির ইঞ্জিন বা পেট্রল ইঞ্জিনও (petrol engine) ব্যবহার হয় ডাইনামো চালাতে। মোটর গাড়ির ইঞ্জিন পেট্রলে চলে বলে ওর নাম পেট্রল ইঞ্জিন। ডিজেল ইঞ্জিন বলে আর-এক রকমের ইঞ্জিন আছে। এই ইঞ্জিনের রূপগুণ অনেকটা পেট্রল ইঞ্জিনের মতো। তবে এটা চলে ডিজেল তেলে। ডিজেল তেল কাকে বলে জানিস ? যখন মাটির ভেতর থেকে পেট্রল বার করা হয় তখন পেট্রল বেরোয় না,—পেট্রল, কেরোসিন, ডিজেল তেল সব একসঙ্গে মিশে বেরোয়। সেই মেশানো তেল আলাদা আলাদা করলে পেট্রল, ডিজেল তেল, কেরোসিন তেল পাওয়া যায়। কাজেই ডিজেল তেল পেট্রলেরই জাতভাই।

"এই ডিজেল ইঞ্জিনও ব্যবহার করা হয় ডাইনামো চালাতে।

"খুব বড়ো পাওয়ার হাউস হলে স্টীম ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার হাউস (Power House) কাকে বলে জানিস ?

যে-বাড়িটায় ইলেকট্রিক তৈরী হয় তাকে বলে পাওয়ার হাউস। পাওয়ার হাউসে ডাইনামো, ব্যাটারি, ইঞ্জিন এই সব থাকে। যে পাওয়ার হাউসে অনেক ডাইনামো থাকে, অনেক ইলেকট্রিক তৈরী করে, সেই পাওয়ার হাউস হলো বড়ো পাওয়ার হাউস। মাঝারি বা ছোটো পাওয়ার হাউসে ডিজেল ইঞ্জিনরাই ডাইনামো চালায়। একেবারে নেহাত বাচ্চা ডাইনামোই পেট্রল ইঞ্জিনে চালানো হয়।

"স্টীম ইঞ্জিনই বল, আর ডিজেল বা পেট্রল ইঞ্জিনই বল, —ইঞ্জিন চালাতে খরচা আছে, পয়সা দিয়ে কয়লা, ডিজেল তেল বা পেট্রল কিনতে হবে তো! কিন্তু আর-এক রকমভাবে ডাইনামো চালানো যায়, তাতে ইঞ্জিন চালানোর জন্য কোনো খরচা নেই। সে ব্যবস্থাটা বোঝার আগে আর একটা পরীক্ষা করে দেখাই।
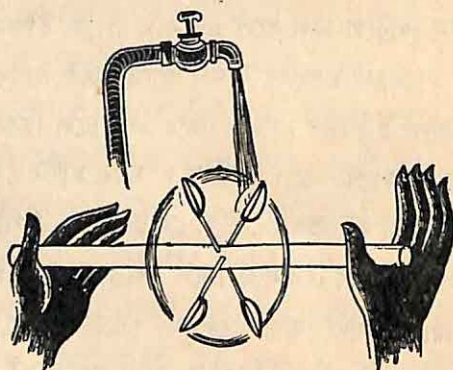
"এই দেখ একটা কাঠের ছোট্ট লাঠিতে গোটাচারেক চামচে গুঁজেছি; এইবারে জলের কল খুলে তার তলায় লাঠিটা ধরে দেখ লাঠিটা ঘুরছে।"

ভোদা বললে, "এ আর কী নতুন কথা বললে ? চামচেগুলোর উপর জল পড়ছে আর জলের চাপে চামচেশুদ্ধু লাঠিটা ঘুরছে।"

খোকন বললে, "ঠিক এইরকম করে জলের চাপে ডাইনামো ঘোরানো যায়। অবশ্য চামচে কাঠের লাঠিতে বেঁধে নয়। মোটা লোহার লাঠিতে ইয়া বড়ো বড়ো লোহার বাটি বা গামলা লাগানো হয় আর খুব উঁচু জায়গা থেকে বিরাট বিরাট নলে করে খুব জোরে জল নিয়ে এসে ঐ লোহার বাটিগুলোয় ফেলা হয়, তখন বাটিশুদ্ধু লোহার লাঠি বা ডাণ্ডাটা ঘোরে। ডাইনামোর আর্মেচারটা ঐ লোহার ডাণ্ডাটার ওপর বসানো থাকে, কাজেই ডাণ্ডাটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আর্মেচারও ঘোরে। এই ব্যবস্থায় কয়লা, পেট্রল, ডিজেল তেল—কিছুই না পুড়িয়ে জল থেকে বিনিপয়সায় ইলেকট্রিক পাওয়া যায়। জল থেকে পাওয়া বলেই এই ইলেকট্রিককে বলে জলবিদ্যুৎ (Hydroelectricity)।

ডি. ভি. সি-র (D.V.C.) নাম শুনেছিস্ তো! ডি.ভি.সি. হলো দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের (Damodar Valley Corporation)-এর সংক্ষিপ্ত নাম। ডি. ভি. সি. একটা কোম্পানি। এরা জলবিদ্যুৎ তৈরী করছে। দামোদর নদী আর তার শাখাপ্রশাখায় বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্যে এতো জল আসে যে নদীর দুকুল ছাপিয়ে বন্যা হয়। ডি. ভি. সি. কোম্পানি এই দামোদর আর অন্য কয়েকটা নদীতে বাঁধ দিয়ে বর্ষাকালে যে জল হয় তা বিরাট বিরাট চৌবাচ্ছায় ধরে রাখছে; এতে প্রথমত লাভ

হচ্ছে যে নদীতে বন্যা হচ্ছে না, আশেপাশের গ্রামের লোকেরা স্বস্তিতে নিশ্বাস নিচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত লাভ হচ্ছে এই যে সারা বছর ঐ চৌবাচ্ছার জল দিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরী করা হচ্ছে—নল দিয়ে দরকারমতো জল টারবাইনে পাঠিয়ে।”

ফটকে জিজ্ঞাসা করলো, “টারবাইন কী ?”

খোকন বললে, “বলতে ভুলে গেছি। টারবাইন (turbine) ঐ বাটি-লাগানো লোহার ডাণ্ডাটাকে বলে।”
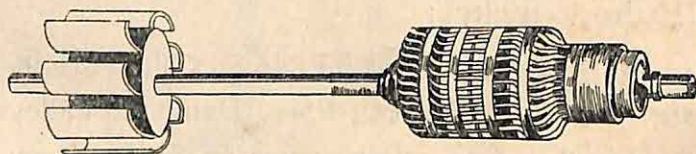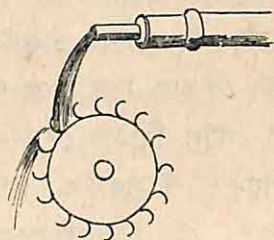
ভোঁদা বললে, “চৌবাচ্ছায় আর কতো জল ধরবে যে সারা বছর টারবাইন চালানো যাবে ?”

খোকন বললে, “দূর বোকা, সে চৌবাচ্ছাগুলো কি এইটুকু-টুকু ? এক-একটা চৌবাচ্ছার ভেতর এই আমাদের বাড়িটার মাপের হাজারখানেক বাড়ি ধরে যায় যে !”

ফটকে বললে, “খোকনদা আজ যা বেকুবই বনেছি যে আর কী বলবো। মণ্টের সঙ্গে গেছি মোড়ের ঐ ইলেকট্রিকের দোকানে ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের জন্যে পাখা ভাড়া করতে। দোকানদার জিজ্ঞাসা করলো, ‘কী পাখা চাই? এ.সি. না ডি.সি.? (A.C. না D.C.)’? সে আবার কীরে বাবা? এ.সি. ডি.সি. কীরে? আমি তো তাজ্জব বনে পালিয়ে এলাম। আর মণ্টের কী হাসি! বলে, ‘এই তুই খোকনদার কাছে ইলেকট্রিক শিখেছিস্! দোকানদারের এক কথাতেই ভোঁ চম্পট!’ কিন্তু খোকনদা এ.সি. আর ডি.সি. কী জিনিস কই বলো নি তো?”

খোকন বললে, “একটা টর্চের বাল্‌ব্ তার দিয়ে টর্চের সেলের সঙ্গে লাগালে যখন বাল্‌ব্ জ্বলে তখন কারেণ্ট কোন দিকে যায় জানিস তো?”

ভোঁদা বললে, “হ্যাঁ, পজিটিভ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে কারেণ্ট নেগেটিভ প্রান্তে যায়।”

খোকন বললে, “হ্যাঁ, যতোক্ষণ বাল্‌ব্‌টা সেলে লাগানো থাকবে ততোক্ষণ কারেণ্ট বাল্‌ব্‌টার ভেতর দিয়ে আর তারের ভেতর দিয়ে এক দিকেই যাবে। এই রকম কারেণ্টকে বলে ডিরেক্ট কারেণ্ট (Direct Current), বা সংক্ষেপে ডি.সি. (D. C.)।

"আচ্ছা, এইবারে সেলটা উল্টো করে লাগালাম, কারেন্টও উল্টো দিকে যেতে আরম্ভ করলো। আবার সেলটা সোজা করে লাগালাম, কারেন্ট আবার সোজা দিকে যেতে আরম্ভ করলো। এই রকম যদি খুব তাড়াতাড়ি সেলটা উল্টো-সোজা উল্টো-সোজা করে লাগাই তাহলে তারে আর বাল্‌বে কারেন্টের দিকও বারবার বদলাবে। এই রকম কারেন্টকে বলে দিক-বদলানো কারেন্ট, বা অল্টারনেটিং কারেন্ট (Alternating Current)—সংক্ষেপে এ.সি. (A.C.)।
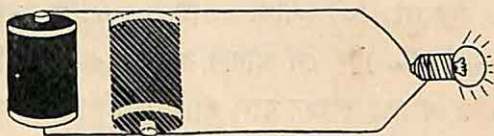
"কোম্পানি থেকে লোকের বাড়িতে যে ইলেক্‌ট্রিক আসে তা ডি.সি. বা এ.সি. দুই-ই হতে পারে। এই আমাদের কোলকাতা শহরেই ধর না কেন,—ইলেক্‌টিক কোম্পানি থেকে ভবানীপুরে ডি.সি. আর বালীগঞ্জে এ.সি. দেয়।"

ভোঁদা বললে, "এ.সি. দিতে হলে তাহলে কোম্পানিকে একটা বাড়তি লোক রাখতে হবে আর সেই লোকটা কোম্পানির ঘরের ব্যাটারির তার একবার সোজা একবার উল্টো করে লাগাবে,—না খোকনদা?"

খোকন বললে, "লোক দিয়ে তার উল্টো-সোজা করে লাগিয়ে হবে না। কেননা, সেকেণ্ডে একশো বার তার খোলা-লাগানো দরকার—কে আর তা করতে পারবে বল? যেখানে কোম্পানি

থেকে এ.সি. দেয়, সেখানে গভরমেণ্টের আইন অনুসারে এমন কারেণ্ট দিতে হবে যে সেই কারেণ্টের দিক সেকেণ্ডে যেন একশো বার বদল হয়: আমাদের দেশে, ইংল্যাণ্ডে, ইউরোপের সব দেশেই নিয়ম হচ্ছে এ.সি. কারেণ্টের বেলায় সেকেণ্ডে একশো বার দিক বদলানো, অ্যামেরিকায় নিয়ম হচ্ছে সেকেণ্ডে একশো কুড়ি বার দিক বদলানো।

"এতোবার দিক বদলানো তো মানুষে করতে পারে না। কাজেই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়। সে-ব্যবস্থাটা কী, বলার আগে আর একটা কথা বলে নি। ডি.সি. কারেণ্ট আর এ.সি. কারেণ্টের ডায়নামো-মোটর সব কিছু আলাদা আলাদা। কাজেই ডি.সি. কারেণ্টের পাখা এ.সি. কারেণ্টে চলবে না। সেই জন্যেই ফটকেকে দোকানদার জিজ্ঞাসা করেছিলো, ফটকেদের ক্লাবে ইলেকট্রিক কোম্পানি কী কারেণ্ট দিয়েছে--এ.সি. না ডি.সি.? সেইমতো পাখা তো দেবে দোকানদার!"

ফটকে বললে, "এ.সি. কি ব্যবস্থায় করে বললে না?"

খোকন বললে, "চুম্বকদের মাঝে আর্মেচার ঘোরালে ইলেক্‌ট্রিক পাওয়া যায়—একথা তো সেদিন বললাম। আজকে এই ইলেকট্রিক তৈরীর ব্যাপারটা আর একটু বিশদ করে বলি।

"আমার তৈরী মোটরটা থেকে একটা কুণ্ডলী আর কমিউটেটারের দুটো পাত খুলে নিলাম; আর্মেচারে মাত্র একটা কুণ্ডলী রইলো আর সেই কুণ্ডলীর তারের দুটো দিক কমিউটেটরের দুটো পাতে লাগানো আছে। তোদের বোঝানোর সুবিধার জন্যে দুটো কার্বনের ব্রাশও এনেছি; এই ব্রাশ দুটো

থেকে দুটো তার দিয়ে একটা টর্চের বাল্‌ব্‌ লাগালাম। এইবার খুব জোরে জোরে আর্মেচার ঘোরালে বাল্‌বে কারেন্ট যাবে, বাল্‌বটা জ্বলবে, একথা তো আগেই বলেছি।

"বাল্‌বে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা ডি.সি. কারেন্ট ; কিন্তু আর্মেচারের তারে কুণ্ডলীতে এ.সি. কারেন্ট যাচ্ছে।"

ভোঁদা বললে, "তা কী করে হবে ? তারের কুণ্ডলীর কারেন্টই তো বাল্‌বে যাচ্ছে, তাহলে একটায় ডি. সি. আরেকটায় এ.সি. কারেন্ট কী করে যাবে ?"

খোকন বললে, "তারের কুণ্ডলী যখন চুম্বকের মাঝে ঘোরে তখন তারের কুণ্ডলীতে এ.সি. কারেন্টই তৈরী হয়। কুণ্ডলীতে কারেন্ট গেলে সেটা চুম্বকের মতো ব্যবহার করে। এ-কথা তো আগেই বলেছি, আর সেই চুম্বকের কোন দিকটা উত্তরমুখী তা কি করে জানা যায় তাও তো তোদের বলেছি।

"আর্মেচারের তারে যখন কারেন্ট আছে তখন সেটাও চুম্বক হবে। ডাইনামোর বেলায় আর-একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে ডাইনামোর আর্মেচার যখন চুম্বক হয় তখন সেই চুম্বকের কোন দিকটা উত্তরমুখী হবে তা নির্ভর করছে আর্মেচারটা ঘোরার পথে ঠিক কোথায় আছে তার উপর ; কুণ্ডলীর যে-কোনো একটা পিঠ ধর,—কুণ্ডলীর এই পিঠটা বিদ্যুৎ চুম্বকের যে মুখটার দিকে এখন যাচ্ছে, এই পিঠটা ঠিক সেইমুখী চুম্বক হবে।"

ভোঁদা আর ফটকে দুজনেই বলে উঠলো, "কী যে বলো বুঝতে পারি না।"

খোকন বললে, "বিষয়টা একটু শক্ত। যাই হোক, আমি তোদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার এই আর্মেচারের কুণ্ডলীর এক পিঠ কালো আর অন্য পিঠ লাল রঙ করলাম; কালো রঙের পিঠ থেকে যে তারটা বেরিয়ে কমিউটেটারে গেছে সেই তারটা আর কমিউটেটারের তারটাও কালো রঙ করলাম আর লাল রঙের পিঠ থেকে বেরোনো তারটা আর সেই তার যে পাতটায় গেছে সেটাকে লাল রঙ করলাম। এইবারে আর্মেচারটা এমনভাবে রাখলাম যে তারের কুণ্ডলীটা দুপাশের উত্তরমুখী ও দক্ষিণমুখী চুম্বক দুটোকে যোগ করে লাইন টানলে যে লাইন হবে সেই লাইনের লম্ব হয়। ধর, কালো পিঠটা নিচের দিকে আছে, দক্ষিণমুখী চুম্বকটা ডানদিকে আছে আর উত্তরমুখী চুম্বক আছে বাঁদিকে। এইবার ধর, আর্মেচারটা ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে তার উলটো দিকে ঘোরাতে আরম্ভ করলাম। তাহলে হলো কি, কালো পিঠটা দক্ষিণ-মুখী চুম্বকের দিকে আর লাল পিঠটা উত্তর-মুখী চুম্বকের দিকে যাচ্ছে। ডাইনামোর বেলায় যে আইনটা এক্ষুনি বললাম, সেই আইন অনুসারে আর্মেচারের কালো পিঠটা দক্ষিণমুখী চুম্বক হবে আর লাল পিঠটা উত্তরমুখী চুম্বক হবে।

"আচ্ছা এইবার তারের কুণ্ডলীটা ডান হাত দিয়ে মুঠো করে ধর দিকি আগের বারের মতন করে। বুড়ো আঙুলটা লাল পিঠটার উপর লম্বভাবে রাখবি কিন্তু। তাহলে কারেণ্ট পাঠানোর ফলে কুণ্ডলী চুম্বক হওয়ার নিয়ম অনুসারে তোর বুড়ো আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলগুলোর মাথা যে দিকে আছে কুণ্ডলীতে কারেণ্টও সেই দিকে যাবে।

"তারের কুণ্ডলীটা আধ পাক ঘোরার পর কালো পিঠটা যখন ওপরের দিকে এসেছে তখন কী অবস্থা হয় দেখ। কালো পিঠটা এখন কিন্তু উত্তরমুখী চুম্বকের দিকে যাচ্ছে, কাজেই কালো পিঠটা হবে উত্তরমুখী চুম্বক আর লাল মুখটা হবে দক্ষিণমুখী চুম্বক। আবার তারের কুণ্ডলীটা ডান হাত দিয়ে মুঠো করে ধর, বুড়ো আঙুলটা এইবার কিন্তু কালো পিঠটার ওপর লম্ব ভাবে রাখবি। আঙুলের মাথা কোন দিকে আছে দেখে বার কর কুণ্ডলীতে কারেণ্ট কোন দিকে যাচ্ছে। দেখবি, আগে কারেণ্ট যে দিকে যাচ্ছিলো এখন তার উল্টো দিকে যাচ্ছে। কাজেই দেখ, তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে এ.সি. কারেণ্ট যায় ডাইনামো ঘোরালে। (বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হলে ৫৬ পৃষ্ঠার দু'রঙা ছবি দেখ)।

"প্রত্যেক পাকে কারেণ্ট দুবার করে দিক বদলায়; আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হবে যে তারের কুণ্ডলী একজোড়া চুম্বকের মুখ পার হলে দুবার দিক বদলায়। যদি দুটোর জায়গায় চারটে চুম্বকের মুখ থাকতো—মানে দুটো দক্ষিণমুখী আর দুটো উত্তরমুখী—তাহলে কুণ্ডলীটার একপাকে চারবার কারেণ্টের দিক বদলাতো। একজোড়া চুম্বকের মুখ পার হওয়াকে বলে একটা সাইক্‌ল্ (cycle)। কাজেই প্রতি সাইক্‌ল্-এ দুবার কারেণ্টের দিক বদল হয়। তাহলে দেখ, একশোবার দিক বদল হতে হলে পঞ্চাশটা সাইক্‌ল হওয়া চাই। আমাদের এখানে ও বিলেতে সেই জন্যে এ. সি. কারেণ্ট পঞ্চাশ সাইক্‌লের আর আমেরিকায় ষাট সাইক্‌লের।

“পঞ্চাশ সাইক্‌লের কারেণ্ট অবশ্য অনেক উপায়ে পাওয়া যায়। তারের কুণ্ডলী সেকেণ্ডে পঞ্চাশ পাক ঘোরাতে পারিস একজোড়া চুম্বকের মুখের ভেতরে বা সেকেণ্ডে এক পাক ঘোরাতে পারিস পঞ্চাশ জোড়া চুম্বকের মুখের ভেতরে। জলবিদ্যুতে চুম্বকের সংখ্যা বাড়িয়ে আর্মেচার আস্তে আস্তে ঘোরানো হয় আর ডিজেল ইঞ্জিনে চুম্বকের সংখ্যা কমিয়ে আর্মেচার জোরে ঘোরানো হয়। স্টীম ইঞ্জিনের বেলায় চুম্বকের সংখ্যা আর আর্মেচারের গতি দুইই মাঝামাঝি।

“আবার আমার ডাইনামোয় ফিরে আসা যাক। ডাইনামো তো ঘুরপাক খাচ্ছে আর তারের কুণ্ডলীতে এ.সি. কারেণ্ট যাচ্ছে। কমিউটেটারের পাত দুটোও তো আর্মেচারের সঙ্গে ঘুরছে, ব্রাশ দুটো কমিউটেটারের পাতে ঠেকে আছে, ব্রাশ দুটো কিন্তু ঘুরছে না। এখন যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, যখনই তারের কুণ্ডলীতে কারেণ্টের দিক-বদল হবে তখনই কমিউটে-টারের পাতও বদলে যাবে ব্রাশ থেকে—তাহলে ব্রাশে লাগানো বাল্‌বে ডি সি. কারেণ্ট যাবে। ব্যাপারটা আরও একটু বিশদ করে বোঝাই। বোঝাবার সুবিধার জন্যে ব্রাশ দুটো রঙ করে নিয়েছি, একটা লাল আর একটা কালো। ধর, কুণ্ডলীতে কারেণ্ট যাচ্ছে লাল দিক থেকে কালো দিকে। আর ধর, লাল ব্রাশটা ঠেকে আছে কমিউটেটারের লাল পাতে। তাহলে বাইরের কারেণ্ট যাবে কালো ব্রাশ থেকে বাল্‌ব্ হয়ে লাল ব্রাশের দিকে। একটা কথা কারেণ্ট সম্বন্ধে বলতে ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে এই যে, কারেণ্ট তার দিয়ে যখন যায় তখন খানিকদূর

গিয়ে আপনা আপনি দিক বদলায় না : এইখানে দেখ তারের কুণ্ডলী, বাল্‌ব, ব্রাশ, বাইরের তার, সব মিলে কারেণ্ট যাবার রাস্তা করেছে, এই রাস্তায় কারেণ্ট সবটাতেই একই দিকে যাবে। কাজেই তারের কুণ্ডলীর ভেতর কারেণ্টের যা দিক, ব্রাশের বাইরেও সেই দিক হবে।

"তারের কুণ্ডলীটা আর্মেচারের সঙ্গে খানিকটা ঘুরে যাওয়ায় কুণ্ডলীর ভেতর কারেণ্ট যেতে আরম্ভ করলো কালো দিক থেকে লালের দিকে। আর্মেচার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে কমিউ-টেটারও ঘুরে গেছে আর তার ফলে এখন আর লাল ব্রাশটা লাল পাতে ঠেকে নেই, লাল ব্রাশটা এখন ঠেকে আছে কালো পাতে আর কালো ব্রাশটা লাল পাতে। তাহলে কারেণ্টের গতির সব রাস্তাটা কি রকম হলো ?"

ভোঁদা বললে, "কেন ? কারেণ্টের গতির দিক তো সব রাস্তাটায় একই হবে। কাজেই কালো পাত থেকে কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে কারেণ্ট লাল পাতে গেলো আর সেখান থেকে কালো ব্রাশ হয়ে বাল্‌ব্ হয়ে লাল ব্রাশ হয়ে কালো পাতে ফিরে এলো।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ। কাজেই দেখ, তারের কুণ্ডলীর ভেতরে কারেণ্ট দিক বদলালেও কমিউটেটারের জন্যে ব্রাশের বাইরে কারেণ্ট সব সময় কালো ব্রাশ থেকে লাল ব্রাশে যাচ্ছে ;— অর্থাৎ ডাইনামোর বাইরে ডি.সি. কারেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

"কিন্তু যদি কমিউটেটার না থাকতো, যদি লাল ব্রাশটা সব সময়ই তারের কুণ্ডলীর লাল প্রান্তে লাগানো থাকতো তাহলে কুণ্ডলীতে কারেণ্টের দিক বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বাল্‌বেও

কারেণ্টের দিক বদলাতো, কুণ্ডলীতে এ.সি. কারেণ্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরেও এ.সি. কারেণ্ট পেতাম। কাজেই দেখ, এ.সি. কারেণ্ট পেতে হলে ডি.সি. কারেণ্ট দেবার ডাইনামোর কমিউটেটারটা খুলে তার জায়গায় দুটো গোল রিঙ লাগালেই চলে; এই রিঙ দুটোর ওপর ব্রাশ দুটো ঠেকানো থাকে আর রিঙ দুটো আর্মেচারের সঙ্গে ঘোরে; কিন্তু আর্মেচারের সঙ্গে রিঙ দুটো ঘুরলেও ব্রাশরা রিঙ বদল করে না বলে তারের কুণ্ডলীর এ.সি. কারেণ্টই বাইরে যায়। (৫৬ পৃষ্ঠার ছবি দেখ)

"চুম্বকের সংখ্যা ও কুণ্ডলীর সংখ্যা বাড়িয়ে অল্টারনেটারের (Alternator) জোর বাড়ানো যায়: এ.সি. ডাইনামোর নাম হচ্ছে অল্টারনেটার।

"একটা কথা জেনে রাখ: ডি.সি. পাওয়ার হাউসে ব্যাটারি থাকে—সে কথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এ.সি. পাওয়ার হাউসে ব্যাটারি থাকে না।"

ভোঁদা জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা এ.সি. আর ডি.সি.—এই দুরকম কারেণ্টের ভেতর কোন রকম কারেণ্ট ভালো?"

খোকন বললো, "ব্যবহার অনুসারে দুটোই ভালো। অনেক কাজ ডি.সি. কারেণ্টে হয় না, আবার অনেক কাজ এ.সি. কারেণ্টে হয় না। তবে বাড়িতে ব্যবহার করার জন্যে বোধ হয় ডি.সি. কারেণ্টই ভালো, কারণ ডি.সি. কারেণ্টে শক কম লাগে। তবে যদি এ.সি.-র ভোল্ট কমিয়ে দিস—অর্থাৎ বাড়িতে দুশো কুড়ি ভোল্ট না দিয়ে যদি একশো দশ ভোল্ট দিস—তাহলে এ.সি. কারেণ্টে দোষ নেই, বরঞ্চ ভালোই। আমাদের দেশে অবশ্য একশো

দশ ভোল্টের চলন নেই ; কিন্তু অন্য অনেক দেশেই একশো দশ ভোল্টের এ.সি. কারেন্ট দেওয়া হয় বাড়িতে ব্যবহারের জন্যে।

"এইবারে এ.সি. কারেন্টের বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলি।

"কয়েকদিন আগে তোদের একটা হিসাব দিয়েছিলাম : কোম্পানির বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে যে তার এসেছে তার রেজিস্টান্স যদি হাজার ওম্ হয় তাহলে আমাদের বাড়ি চল্লিশ ওয়াট ইলেকট্রিক দেওয়ার জন্যে কোম্পানির তেত্রিশ ওয়াট খরচা হয় ; ভোঁদা আবার অঙ্ক কষে বলেছিল যে কোম্পানির এই তারের রেজিস্টান্সের জন্য শতকরা বিরাশি ভাগ ইলেকট্রিক লোকসান দেয়। এখন এই লোকসান কী করে কমানো যায় ? একটা সোজা উপায় হলো, তারের রেজিস্টান্স কমানো। অবশ্য রেজিস্টান্স কমানো যায় মোটা তার দিয়ে, কিন্তু মোটা তার দিতে হলে তারের দাম পড়ে যায় অনেক।"

ভোঁদা বললে, "তারটা লম্বায় ছোটো করলেও তো রেজিস্টান্স কমে। আমাদের বাড়ি থেকে ইলেকট্রিক কোম্পানির পাওয়ার হাউস একশো মাইল দূরে না করে এক মাইল দূরে করলেই তো চলে।"

খোকন বললে, "একশো মাইল দূরে কি আর কেউ পাওয়ার হাউস শখ করে করতে চায় ? দায়ে না পড়লে অতো দূরে পাওয়ার হাউস কেউ করে না।"

ফট্‌কে বললে, "দায় আবার কিসের ?"

খোকন বললে, "ধর, জলবিদ্যুৎ তৈরী করছিস্,—তখন তো

বাপু পাওয়ার হাউস নদীর ধারেই বসাতে হবে আর ইলেকট্রিক খরচা করার শহর যে নদীর ধারেই হবে তা কে বললে ? এই যে ডি.ভি.সি. মাইথনে জলবিদ্যুৎ তৈরী করছে, সেই বিদ্যুৎ খরচা হবে কোলকাতা অবধি সব জায়গায়। মাইথন কোলকাতা থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে। তারপর ধর, যদি ইঞ্জিন দিয়ে ডাইনামো চালাতে হয়, তাহলে কয়লার খনির কাছে পাওয়ার হাউস বসানোই সুবিধের,—কয়লা সস্তায় পাওয়া যাবে। কাজেই নানান কারণে পাওয়ার হাউস সব সময়ে শহরের কাছে বসানো যায় না। তাই সব সময় কোম্পানির বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি অবধি তারের রেজিস্টান্স কমানো সম্ভব নয়। তাহলে কী করা যায় ?

"কোম্পানির তারে যে ওয়াট খরচা হচ্ছে সেটা তো তারের রেজিস্টান্সকে কারেণ্টের বর্গ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায়।"

ফটকে বললে, "হ্যাঁ। ওয়াট = ওম্ × (অ্যামপিয়ার)^{২}।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ। তারে যে ওয়াট নষ্ট হচ্ছে সেটা কমাতে হলে তারের যখন ওম্ কমানো গেলো না, তখন মোটা তার দিয়ে তারে অ্যামপিয়ার কমানোর চেষ্টা করা যাক।"

ভোঁদা বললে, "তা কী করে হবে ? আমাদের বাড়ি চল্লিশ ওয়াটের আলো জ্বালাতে $\frac{২}{১১}$ অ্যামপিয়ার কারেণ্ট তো লাগবেই —সেদিন হিসেব করা হয়েছে। আর এই কারেণ্ট তো কোম্পানির পাওয়ার হাউস থেকে কোম্পানির তার বেয়েই আসবে। কাজেই কারেণ্ট কী করে কমাবে ?"

খোকন বললে, "সেই কথাই তো বলবো। তবে ঐ ভগ্নাংশ $\frac{২}{১১}$র বদলে হিসেব করার সুবিধার জন্যে ধর আমার

বাড়িতে দুশো কুড়ি ওয়াট জ্বালাচ্ছি ; তাহলে আমাদের এক অ্যামপিয়ার দরকার কোম্পানির বাড়ি থেকে। এখন যদি এমন কোনো উপায় করা যায় যে আমাদের বাড়িতে এক অ্যামপিয়ার এলো অথচ কোম্পানির তারে মাত্র সিকি অ্যামপিয়ার কি আরও কম কারেন্ট গেলো—তাহলেই সব দিক থেকে ঠিক হয়। কিন্তু এরকম অদ্ভুত ব্যাপার কী করে করা যায় ?

"ডি.সি. কারেন্টে এই রকম ব্যবস্থা করা যায় না কিন্তু এ.সি. কারেন্টে যায়।

"একটা গোল লোহার রিঙ নিয়ে তাতে বেশ কয়েক পাক তার জড়ালাম। এইবার ঐ রিঙে অন্য আর খানিকটা তার জড়িয়ে তাতে একটা বাল্‌ব্‌ লাগালাম। ধর, এইবার প্রথম তারটায় দুশো কুড়ি ভোল্টের এ.সি. কারেন্ট পাঠালাম, দেখবি যে দ্বিতীয় তারে লাগানো বাল্‌ব্‌টা জ্বলছে। কিন্তু এ.সি. কারেন্ট না পাঠিয়ে যদি ডি.সি. কারেন্ট পাঠাস্‌ তো কিচ্ছু হবে না, বাল্‌ব্‌ জ্বলবে না। এই যে লোহার রিঙটা দিয়ে একটা তার থেকে আর একটা তারে এ.সি. কারেন্ট পাঠালাম, এই রিঙটাকে বলে ট্রান্সফর্মার (Transformer)।
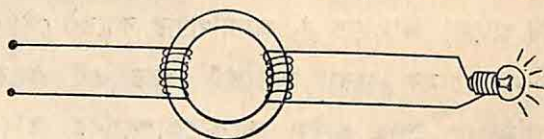
"ট্রান্সফর্মারের কয়েকটা গুণ আছে। প্রথমত ট্রান্সফর্মারের প্রথম তারে যতো ওয়াট পাঠাবি সবটাই দ্বিতীয় তারে চলে আসবে ; অর্থাৎ যদি প্রথম তারে দুশো কুড়ি ওয়াট ইলেকট্রিক

পাঠাস্ তো দ্বিতীয় তারে আর বাল্‌বে ঐ দুশো কুড়ি ওয়াটই খরচা হবে। ট্রান্সফর্মারের দ্বিতীয় গুণ হলো, প্রথম তারে যতো ভোল্ট দিবি দ্বিতীয় তারে তার থেকে কম বা বেশি ভোল্ট পাওয়া যেতে পারে। প্রথম তার রিঙটাকে যে ক' পাক দিয়েছে, সেই পাকের সংখ্যা দিয়ে প্রথম তারের ভোল্টকে ভাগ করলে যা হবে, দ্বিতীয় তারের পাকের সংখ্যা দিয়ে দ্বিতীয় তারের ভোল্টকে ভাগ করলেও তাই হবে। ধর, প্রথম তারে ২২০ ভোল্ট দিয়েছি আর ধর প্রথম তারটা রিঙে ১০ পাক দিয়েছে আর দ্বিতীয় তারটা রিঙে ১০০ পাক দিয়েছে—তা হলে দ্বিতীয় তারে ভোল্ট হবে ২২০০ ভোল্ট। কারণ $\frac{২২০}{১০} = \frac{২২০০}{১০০}$।

"যদি দ্বিতীয় তার মাত্র এক পাক দিতো তো ভোল্ট হতো মাত্র ২২ ভোল্ট, কারণ $\frac{২২০}{১০} = \frac{২২}{১}$।

"এইবারে দেখ, ট্রান্সফর্মার দিয়ে কী মজা করা যায়। ধর অল্টারনেটার দিচ্ছে ২২০ ভোল্ট আর ২২০ ওয়াট। এইবারে একটা ট্রান্সফর্মার বসানো হলো অল্টারনেটারের কাছে; এই ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিতে ধর দশপাক আছে। (প্রাইমারি Primary Winding) হলো "প্রথম কুণ্ডলী" কথাটার সংক্ষেপ। আর "সেকেণ্ডারি" হলো দ্বিতীয় কুণ্ডলী (Secondary Winding) কথাটার সংক্ষেপ)। আর ধর ঐ ট্রান্সফর্মারের সেকেণ্ডারিতে আছে হাজার পাক। তাহলে সেকেণ্ডারিতে ভোল্ট হবে ২২,০০০ ভোল্ট। কারণ $\frac{২২০}{১০} = \frac{২২০০০}{১০০০}$।

"কিন্তু সেকেণ্ডারিতে ওয়াট যাবে সেই ২২০ ওয়াট; তাহলে সেকেণ্ডারিতে কারেণ্ট মাত্র $\frac{১}{১০০}$ অ্যামপিয়ার।

"এই বারে এই $\frac{১}{১০০}$ অ্যামপিয়ার কারেণ্ট নিয়ে আসা হলো লম্বা তার দিয়ে আমাদের বাড়ির কাছে। সেখানে আর-একটা ট্রান্সফর্মার বসানো হলো : এটার প্রাইমারিতে আছে হাজার
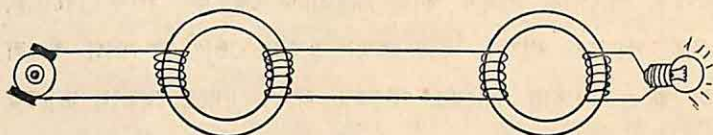
পাক আর সেকেণ্ডারিতে আছে দশ পাক। প্রথম ট্রান্সফর্মারের সেকেণ্ডারিটাই এই দ্বিতীয় ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারির সঙ্গে লাগানো আছে—কাজেই দ্বিতীয় ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারির ভোল্টও ২২,০০০। তা হলে এই দ্বিতীয় ট্রান্সফর্মারের সেকেণ্ডারির ভোল্ট হবে ২২০ ভোল্ট। কারণ,

$$\frac{২২০০০}{১০০০} = \frac{২২০}{১} \text{।}$$

"এই দ্বিতীয় ট্রান্সফর্মারের সেকেণ্ডারিটা আমাদের বাড়িতে লাগানো আছে ; কাজেই আমরা ২২০ ভোল্ট পেলাম আমাদের বাড়িতে। আর ওয়াট সেই ২২০ ওয়াটই যাবে, কারণ ট্রান্সফর্মারের ভিতর দিয়ে এলে ইলেকট্রিকের ওয়াট তো ঠিকই থাকে, বদলায় না। কাজেই আমরা বাড়িতে সেই এক অ্যামপিয়ার পেলাম অথচ পাওয়ার হাউস থেকে আমাদের বাড়ি অবধি তারে মাত্র $\frac{১}{১০০}$ অ্যামপিয়ার এসেছে। এই তারের রেজিস্টান্স যদি হাজার ওম্ হয় তা হলে ট্রান্সফর্মার দেওয়ার তারে ওয়াট খরচা হবে মাত্র ১০০০ওম্ × ($\frac{১}{১০০}$ অ্যামপিয়ার)^{২} = $\frac{১}{১০}$ ওয়াট। অথচ ট্রান্সফর্মার না দেওয়া হলে তারে ওয়াট খরচা হতো

১০০০ওম্ × (১ এ্যামপিয়ার)^{২} = ১০০০ ওয়াট। কাজেই দেখ, তুটো ট্রান্সফর্মার দেওয়ায় তারে যে ইলেকট্রিক খরচা হতো সেটা দশ হাজার ভাগ কমে গেলো।

"তাহলে দেখ, এ.সি. কারেণ্টের একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে, ইলেকট্রিক পাঠানোর সময় তারে ইলেকট্রিক নষ্ট হওয়াটা কমানো যায়। এই বিশেষ গুণের জন্মেই এ.সি.-র এতো কদর। বিশেষত যেখানে তু-চারশো মাইল দূরে ইলেকট্রিক পাঠাতে হয় সেখানে তো এ.সি. না হলে চলেই না।"

"কিন্তু"—ভোঁদা কী যেন বলতে যাচ্ছিলো।

খোকন ধমক দিয়ে বললো, "আর কিন্তু নয়। এই কদিন ধরে যা বলেছি তাই ভালো করে হজম করবার চেষ্টা কর—তাহলেই একটা ছোটোখাটো বিত্যুৎ-বিশারদ হয়ে যেতে পারবি।"
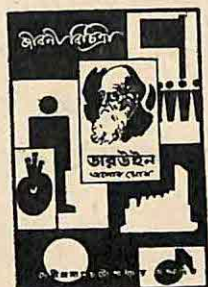
———

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক : বিদ্যুৎ-বিশারদ	: দেবীদাস মজুমদার
দুই : মুদ্রণ-বিশারদ	: অশোক ঘোষ
তিন : মোটর এঞ্জিনিয়ার	: দেবীদাস মজুমদার
চার : বীক্ষণ-বিশারদ	: কমলেশ রায়
পাঁচ : বিমান-বিশারদ	: দেবব্রত বসু
ছয় : রেডিও-বিশারদ	: জ্যোতির্ময় দে
সাত : ফোটোগ্রাফার	: কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইত্যাদি ইত্যাদি

আমরাও হতে পারি—শুধু তাই নয়, আমাদেরও হতে হবে। কেননা আজ আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড যুগ-পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে—হাজার বছরের পুরোনো যে-অচল খোঁটায় আমাদের ভাগ্য বহুদিন বাঁধা পড়ে ছিলো তা উপড়ে ফেলে বিদেশী শাসনমুক্ত এই দেশকে শিল্পে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। আজ আর যন্ত্রকে ভয় পেয়ে বসে থাকা চলবে না—হাতের কাজকে ছোট মনে করবার, ঘৃণা করবার দিন নয় আর। তাই এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা। যাঁদের দিয়ে বইগুলি লিখিয়েছি তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের বিভাগে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের বলেছি : আপনাদের ওই জ্ঞানের ঐশ্বর্যই আজ একটা ঋণ হয়েছে—দেশের কিশোর-কিশোরীদের কাছে ঋণ। আপনারা যা জেনেছেন, শিখেছেন তা সহজ করে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে যন্ত্র-কৌশলের নানা বিভাগে ওরা সত্যিই আগামীকালের বিশারদ হয়ে ওঠে।